তিন গোয়েন্দা

# অপারেশন অ্যালিগেটর

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

রকিব হাসান

রহস্যময় সব ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে
রকি বীচ চিড়িয়াখানায়।
ডিরেক্টর রিচার্ড বোম্যানের সন্দেহ, স্যাবটাজ।
বানরে ছিঁড়ল বিদ্যুতের তার।
ঝড় নেই, বাতাস নেই, বাঘের ঘেরে
গাছের ডাল ভেঙে পড়ল অকারণে।
ভেন্টের মুখ দিয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এল
বিশাল এক অজগর।
উধাও হলো তুষার চিতা।
এবং তদন্ত করতে গিয়ে 'অপারেশন অ্যালিগেটর'এ
জড়াল তিন গোয়েন্দা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

# অপারেশন অ্যালিগেটর

রকিব হাসান

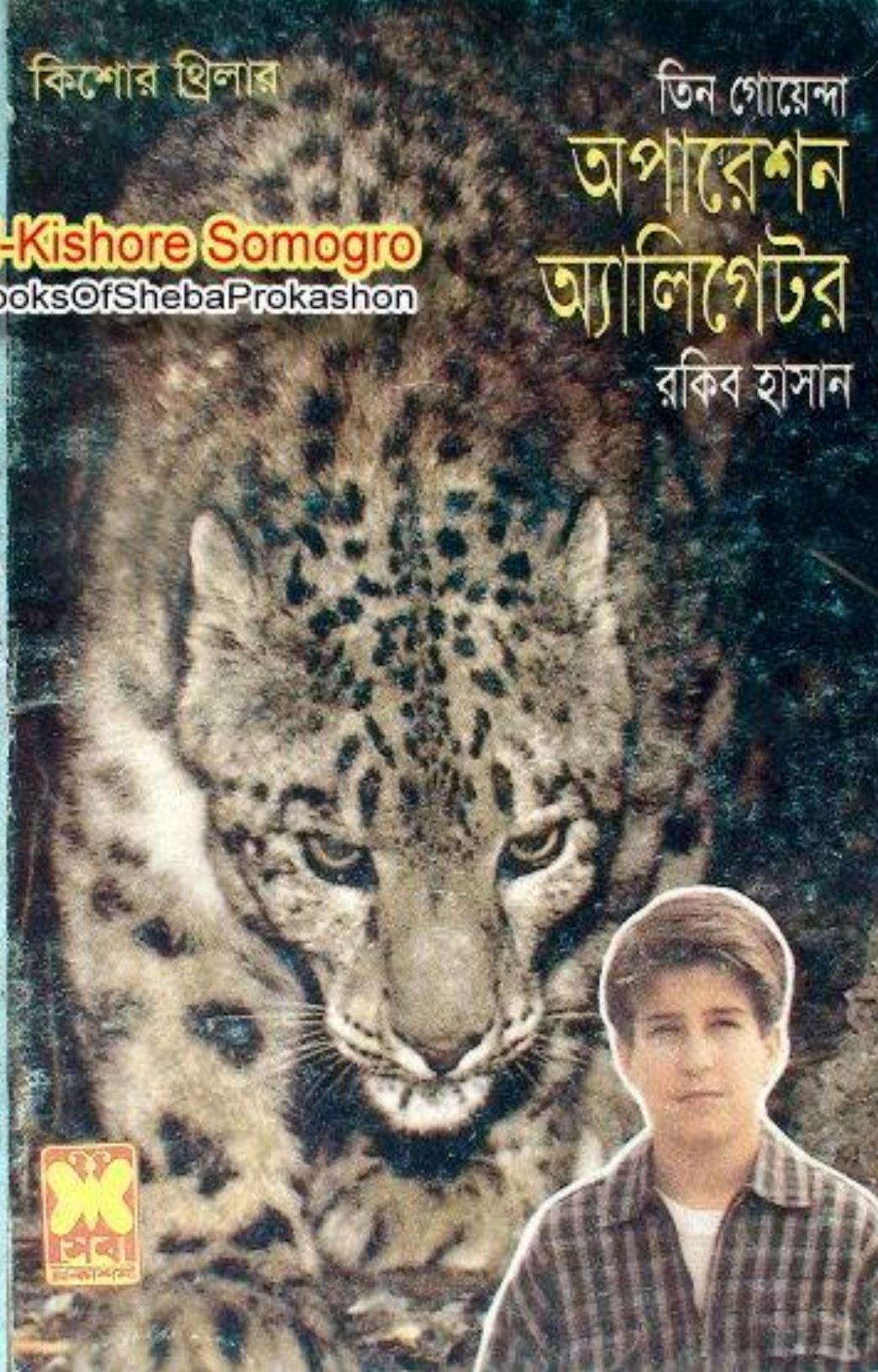

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Book Series
Liked
Following
Message
Timeline
About
Photos
Likes
More

# অপারেশন অ্যালিগেটর

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

'ওই যে, মুসার দোস্ত,' হেসে বলল রবিন।

'হাতি আবার মুসার দোস্ত হলো কবে?' বুঝতে পারল না কিশোর।

'অমিলটা দেখলে কোথায়? রঙেও মিল। খাওয়ায়ও।'

হেসে ফেলল কিশোর। রকি বীচ চিড়িয়াখানার রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পাঁচ টন ওজনের হাতিটাকে দেখছে। এ মুহূর্তে খাচ্ছে না হাতিটা। নখের পরিচর্যা চলছে ওর। একজন জু কীপারের নির্দেশে নিতান্ত বাধ্য ছেলের মত সামনের একখানা গোদা পা তুলে ধরেছে। উখা দিয়ে ঘষে ঘষে নখ সমান করে দিচ্ছে জু কীপার। হাতিটার কাছেই রয়েছে তিন গোয়েন্দা।

'শুনে ফেলেছি কিন্তু,' খানিক দূরে হাতির একেবারে শুঁড়ের কাছে দাঁড়ানো মুসা ডেকে বলল। একটা টি-শার্ট গায়ে দিয়েছে যেটার বুকের কাছে লেখা জু ইনটার্ন। প্রতি গ্রীষ্মেই উৎসাহী কিছু ছাত্রকে ভলান্টিয়ার নিয়োগ করে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। তাতে চিড়িয়াখানারও প্রয়োজন মেটে, ছাত্ররাও জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে মূল্যবান জ্ঞান আহরণ করে। এবারের গ্রীষ্মে মুসাও ভলান্টিয়ার হয়েছে।

'নখে নেল পলিশও লাগাবে নাকি?' হাসতে হাসতে বলল রবিন।

'মাঝেসাঝে লাগায় না তা নয়,' জবাব দিল কিশোর। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে বিশাল প্রাণীটাকে। যতবার এই খসখসে, বাদামী চামড়া, কুলার মত কান আর অদ্ভুত শুঁড়ওয়ালা প্রাণীগুলোকে দেখে ততবারই অবাক হয়। কত বড় জীব। আর কি অদ্ভুত!

রূপ চর্চা শেষ হলো। মাটিতে শুঁড় নামিয়ে দিল হাতি।

'সরে যাও!' চিৎকার করে মুসাকে সাবধান করে দিয়ে সরে গেল কীপার। কিন্তু মুসা সরার আগেই একগাদা ধুলোবালি শুঁড় দিয়ে মাটি থেকে টেনে নিয়ে ফোয়ারার মত নিজের গায়ে ছিটিয়ে দিল হাতিটা।

'খাইছে!' কোঁকড়া তারের জালের মত চুল থেকে ধুলো ঝাড়তে শুরু করল মুসা।

হো-হো করে হেসে উঠল রবিন। কিশোরও হাসছে। মুসাকে নিয়ে গোলাবাড়ির মত বিরাট এক ছাউনিতে ঢুকে গেল কীপার। খানিক পরেই সাফ-সুতরো হয়ে এসে দুই বন্ধুর সঙ্গে রেলিঙের কাছে দাঁড়াল মুসা। হাতে বড় এক প্যাকেট পপ-কর্ন।

'তোমার দোস্তকে ভাগ দিলে না?' রবিনের মুখে মিটিমিটি হাসি।

'দেখো,' গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল মুসা, 'হাতিকে নিয়ে হাসাহাসি কোরো না। জঙ্গলের আসল রাজা ওই হাতি। পশুর রাজা যাকে বলা হয়, ওই সিংহ, হাতির কাছে

কিছু না। হাতি মাড়িয়ে গেলেই ভর্তা হয়ে যাবে সিংহ।'

'অত কাছে যে যাও,' হাতিটাকে দেখাল রবিন, 'তোমার গায়ে যদি পা তুলে দেয়?'

'দেবে না। গিনি আমার বন্ধু,' স্নেহের দৃষ্টিতে হাতিটার দিকে তাকাল মুসা। 'সারা চিড়িয়াখানায় ওকেই আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ। চলো, বাঘের এলাকায়। একটা তুষার চিতা এসেছে।'

আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মুসা। চওড়া, খোয়া বিছানো রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে পার্কের ভেতর দিয়ে। দেখতে দেখতে চলেছে কিশোর। চমৎকার নকশা করা হয়েছে নতুন এই চিড়িয়াখানার। ঝোপঝাড়, গাছপালায় ছাওয়া। প্রায় আসল বনের মতই লাগে দেখতে।

'চিড়িয়াখানায় আসার দিন বটে আজ,' দুই হাত টান টান করে ছড়িয়ে দিল রবিন। আকাশের দিকে চোখ। গাঢ় নীল রঙ। ঝলমলে রোদ।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। দিন ভাল বলে দর্শকও হয়েছে প্রচুর। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই।

'চিড়িয়াখানা আমেরিকানদের ভীষণ পছন্দ,' মুখের মধ্যে একটা পপ-কর্ন ছুঁড়ে দিল মুসা।

'হুঁ,' রবিনও একমত।

চিড়িয়াখানার অন্য একটা অংশে চলে এল ওরা। কাদায় ভরা। ঘাসে ছাওয়া। দলে-মুচড়ে ভেঙে আছে ঘাসের ডগা। ডোবার মধ্যেও কাদা।

আবার রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ওরা।

'আফ্রিকান জলাভূমি তৈরি করা হয়েছে এখানে,' মুসা বলল। 'যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করে দেয়া হয়েছে জন্তু-জানোয়ারদের জন্যে।'

ডোবার মধ্যে মস্ত একটা জিনিসকে নড়তে দেখল রবিন। 'দেখো দেখো,' চিৎকার করে উঠল সে, 'পাথরটা কি রকম নড়ছে!' তারপর চিনতে পারল জিনিসটাকে। 'ও, জলহস্তী।'

বিশাল মুখটা হাঁ করে মানুষের আঙুলের সমান মোটা দাঁতগুলো দেখিয়ে দিল জলের হাতিটা।

এগিয়ে চলল তিনজনে। পার হয়ে এল 'ক্যাট কম্পাউন্ড' লেখা একটা সাইনবোর্ড। এ জায়গাটাতে বড় বড় গাছের জঙ্গল আর ঘন ঝোপঝাড়। এশিয়ান জঙ্গলের মত। একটা ঘেরের মধ্যে গাছের ছায়ায় দুটো বাঘকে শুয়ে থাকতে দেখল রবিন।

রেলিং দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে জায়গাটাকে। বাঘের কাছ থেকে দর্শকদের আলাদা করে রাখার জন্যে। রেলিঙের ওপাশে ঘেরের ভেতরে কংক্রীটের তৈরি গভীর পরিখা। পানি নেই। পরিখার অন্যপারে রাখা হয় জানোয়ারগুলোকে।

'অনেক জায়গাতেই এমন পরিখা আছে,' মুসা জানাল। 'পরিখা বানানো হয়েছে যাতে জন্তু-জানোয়ারেরা পার হয়ে রেলিঙের কাছে আসতে না পারে।'

'ভাল বুদ্ধি,' কিশোর বলল। 'বদ্ধ খাঁচায় থাকতে হচ্ছে না। দর্শকদের কাছেও চলে আসতে পারছে না।'

'আসলেই ভাল বুদ্ধি,' রবিন তাকিয়ে আছে পরিখার ওপারের হলুদের ওপর কালো ডোরাকাটা বিরাট বিড়ালের মত জীবগুলোর দিকে। অলস ভঙ্গিতে শুয়ে বসে আছে, বড়ই নিরীহ চেহারা এখন। প্রয়োজনে যে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, ওই মুখ দেখলে এখন অনুমান করা যাবে না।

কিশোরের মনে হচ্ছে, সত্যিকারের কোন ঘন জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। আঠা আঠা গরম। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে বনের মধ্যে বাঘ দেখছে।

আবার হাঁটতে লাগল ওরা। পাথর আর উঁচু উঁচু বালির ঢিবিতে ভরা দক্ষিণ আমেরিকান বনের পরিবেশে এসে ঢুকল। পাথরের ওপর শুয়ে আছে দুটো হালকা বাদামী রঙের কুগার, পাহাড়ী সিংহও বলা হয় এদের।

'পাথরগুলো আসল না,' মুসা বলল। 'গুনাইট নামের একধরনের সিনথেটিক জিনিস দিয়ে তৈরি। বেশির ভাগ পাথর, গুহা, গাছপালা ওই জিনিস দিয়ে বানানো। জন্তু-জানোয়ারের পরিচিত পরিবেশের মত করে সাজানো হয়েছে।'

একটা ঘেরের কাছে অনেক দর্শককে ভিড় করে থাকতে দেখা গেল। সেদিকে আঙুল তুলে রবিন বলল, 'ওখানে কি হচ্ছে?'

গমগম করছে লোক। প্রচুর গুঞ্জন। অনেকের হাতে ক্যামেরা রেডি। বাচ্চাকে দেখানোর জন্যে কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছে কেউ কেউ।

পার্বত্য এলাকার মত করে বানানো হয়েছে জায়গাটা। গ্রীষ্মকালেও তুষারের ছোপ দেখা যাচ্ছে ওখানে।

'হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের নকল,' মুসা জানাল। 'ওখান থেকেই আনা হয়েছে তুষার চিতাটা। তুষারগুলোও কিন্তু আসল না।'

'কিছু একটা হবে মনে হচ্ছে ওখানে,' রবিন বলল। 'খবরের কাগজের লোক দেখতে পাচ্ছি।'

একজন লোক আর একজন মহিলাকে দেখা গেল, দুটো সাইন তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সাইনগুলোতে ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে তার বাংলা করলে দাঁড়ায়: চিড়িয়াখানা অমানবিক; আর: জানোয়ারগুলোকে মুক্তি দাও।

ঘটনাটা কি, ভাবছে রবিন। কি হবে ওখানটায়?

তুষার চিতার ঘেরের মধ্যে একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন এক সুদর্শন ভদ্রলোক। শার্ট-টাই পরা। মুখের চামড়া রোদে পোড়া বাদামী। সোনালি চুল। বয়েস চল্লিশের ঘরে।

'রকি বীচ চিড়িয়াখানায় স্বাগতম,' বক্তৃতার ঢঙে শুরু করলেন তিনি। 'আমার নাম রিচার্ড বোম্যান। এই চিড়িখানার ডিরেক্টর। আজ আমাদের জন্যে একটা মহা আনন্দের দিন। কারণ একটা তুষার চিতাকে আমরা দর্শকদের সামনে হাজির করতে পারছি। একজন মাননীয়া ইয়াং লেডির কাছ থেকে চিতাটা উপহার পেয়েছি আমরা। তিনি প্রিন্সেস চন্দ্রাবতী। ভারতের কানঝা রাজ্যের রাজকুমারী।...ইয়োর হাইনেস, আপনি নিজেই এসে দয়া করে এই চমৎকার প্রাণীটির কথা কিছু বলুন আমাদের।'

কিশোর দেখল, ওদেরই সমবয়েসী একটা মেয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে মঞ্চে আরোহণ করল। সুন্দরী। বাদামী চামড়া। কালো, লম্বা চুল; কালো বড় বড় চোখ। পরনে গোলাপী শাড়ি।

'হ্যালো,' স্পষ্ট, পরিষ্কার ইংরেজিতে দর্শকদের উদ্দেশে বলল রাজকুমারী। 'আগেই জেনেছেন, আমার নাম চন্দ্রাবতী। ভারতের উত্তরাঞ্চলের কান্‌ঝা নামের এক ক্ষুদ্র রাজ্যে আমার বাড়ি। কয়েক বছর আগে একটা তুষার চিতার বাচ্চা উপহার হিসেবে পাই আমি। নাম রাখি কান্তা। আমার খুব প্রিয় পোষা জানোয়ার।'

মন দিয়ে শুনছে দর্শকরা। আমেরিকায় কেন এসেছে, জানাল প্রিন্সেস। পড়তে এসেছে।

'কান্তাকে কাছে কাছে রাখতে চেয়েছি আমি,' মলিন হাসি হাসল সে। 'তাই দেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু ডরমিটরিতে চিতাবাঘ রাখার অনুমতি মিলল না। তাই ওটা রকি বীচ চিড়িয়াখানাকে উপহার দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল জনতা। কিশোর লক্ষ করল, স্পষ্ট ইংরেজি বললেও মাতৃভাষার টান লুকাতে পারছে না চন্দ্রাবতী।

'দুই মাস আগে রকি বীচে এসেছি আমি,' রাজকুমারী বলল। 'এখানে সবাই আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করছে। আমি আশা করব, আমার কান্তাও এই ব্যবহার পাবে এখানকার মানুষের কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।'

আবার হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাল জনতা।

মঞ্চ থেকে নেমে এল রাজকুমারী। তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন আবার বোম্যান।

'কান্তাকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার আগে,' বোম্যান বললেন, 'আরও একজনকে আপনাদের সামনে হাজির করতে চাই। আমাদের জন্যে তিনিও এক বিশেষ উপহার। তিনি একজন বিশিষ্ট প্রকৃতিবিদ এবং জন্তু-প্রেমিক। তাঁর নাম উইলিয়াম এ. বেরিংটন। তুষার চিতার ব্যাপারে তিনি এখন বলবেন আপনাদের।'

তাকিয়ে আছে রবিন আর কিশোর। মঞ্চে উঠলেন মিস্টার বেরিংটন। কর্কশ চেহারা। কেশরের মত ঝাঁকড়া সাদা চুল। খাকি সাফারি পরেছেন। বিশাল এক গ্রিজলি ভালুকের মত লাগল তাঁকে রবিনের কাছে। মনে হলো সিংহের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ, কুমিরকে মুগ্ধ করতে এবং ধূর্ত শেয়ালকে সহজেই ধোঁকা দিতে পারে এই লোক।

'কেমন আছেন আপনারা?' দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়তে নাড়তে আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন বেরিংটন, 'আমি ওই খামখেয়ালী বুড়ো কোটিপতিদের একজন, যাদের কথা মাঝে মাঝে আপনারা পত্রিকায় পড়ে থাকেন। আমার সৌভাগ্য, এত টাকা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি যে টাকা রোজগারের জন্যে কখনোই আমাকে খাটাখাটনি করতে হয়নি। এতে করে জন্তু-জানোয়ারের পেছনে ব্যয় করার জন্যে প্রচুর সময় আমি পেয়েছি। আমি ওদের শিকার করেছি, ধরে এনেছি, ওদের নিয়ে গবেষণা করেছি।'

'ভালই যদি বাসে,' ফিসফিস করে বলল রবিন, 'শিকার করতে হাত ওঠে কিভাবে? শিকার মানে তো খুন।'

'অনেক বড় বড় শিকারী ছিলেন, যাঁরা জন্তু-জানোয়ার ভালবাসতেন, এদের জন্যে অনেক কিছু করে গেছেন; জিম করবেট তার বড় প্রমাণ,' জবাব দিল কিশোর। 'অনেক সময় জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যা স্বাভাবিক রাখার জন্যে মেরে

ফেলতে হয়। শিকারীরা সাহায্য করে তাতে। কোন বুনো প্রাণী যদি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়–যেমন, বাঘ যদি মানুষখেকো হয়, কিংবা হাতি খেতের ফসল নষ্ট করতে থাকে, মানুষ মারে; তাকেও মেরে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।'

'উপকূল থেকে কিছুদূরে ছোট একটা দ্বীপে আমার বাসস্থান,' বেরিংটন বলছেন। 'ছোটখাট একটা চিড়িয়াখানাও আছে ওখানে আমার। মাস দুই আগে মিস্টার বোম্যানের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, আমার কাছে কোন পুরুষ তুষার চিতা আছে কিনা। অনুরোধ জানিয়েছিলেন, থাকলে কিছুদিনের জন্যে সেটা চিড়িয়াখানাকে ধার দিতে পারব কিনা। একটা মাদী চিতা পেতে যাচ্ছেন তিনি। সেটার জন্যে একটা উপযুক্ত স্বামী দরকার।'

বেরিংটন হাসলেন। দেখাদেখি দর্শকদের অনেকেও হাসল।

'যাই হোক,' কোটিপতি জন্তু-প্রেমিক বললেন, 'আমার কাছে একটা পুরুষ চিতা আছে। কয়েক হপ্তার মধ্যেই সেটাকে এখানে নিয়ে আসা হবে। তারপর দেখতে চাই, কি ঘটে। আমি আশা করব, ভাল কিছুই ঘটবে। আরও কিছু তুষার চিতার মুখ দেখতে পাবে পৃথিবী।'

প্রচুর করতালি আর চিৎকারের মাধ্যমে বেরিংটনকে স্বাগত জানাল জনতা। মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন তিনি।

'এখন, আমাদের আসল মেহমানকে দেখানোর পালা,' বোম্যান বললেন। 'অনুরোধ করছি, একে আর হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন না। হই-চই একদম সহ্য করতে পারে না তুষার চিতা। ঘাবড়ে যেতে পারে।' টেলিভিশনের উপস্থাপকের মত নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'রকি বীচের প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমাদের কান্তা আসছে।'

ঘেরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন বোম্যান। নীরব হয়ে গেল জনতা। তুষার চিতার আগমনের অপেক্ষা করছে। কিন্তু আসছে না চিতাটা।

'কি হলো?' রবিনের প্রশ্ন।

'ওই যে, আসছে,' মুসা বলল। 'বেশি মানুষ দেখেই বোধহয় আসতে দ্বিধা করছে।'

ঘেরের কাছে একটা গুনাইট পাথরের ভেতর থেকে বেরোতে দেখা গেল চিতাটাকে।

পুরোপুরি চুপ থাকতে পারল না দর্শক। চাপা গুঞ্জন উঠল। কেন, বুঝতে পারছে কিশোর। তুষার চিতার রূপ দেখে সে-ও মুগ্ধ। বাঘের চেয়ে আকারে ছোট। ধোঁয়াটে-ধূসর চামড়ায় কালো বড় বড় ছোপ।

'হাঁটে কি করে দেখো!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

স্বচ্ছন্দ গতিতে, সাপের মত নিঃশব্দে, রাজকীয় ভঙ্গিতে হেলেদুলে কৃত্রিম পাহাড়ের কিনার ধরে এগিয়ে এল চিতাটা। কৃত্রিম তুষারে পড়ে থাকা এক টুকরো লাল কাপড়ের কাছে এসে থামল। শুঁকল কাপড়টা।

'চন্দ্রাবতীর শাড়ির টুকরো,' মুসা জানাল। 'রাজকুমারীর গায়ের গন্ধ পরিবেশটাকে ঘরোয়া ভাবতে সাহায্য করে চিতাটাকে।'

রেলিঙের ধার ঘেঁষে রাজকুমারীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রবিন। কান্তার

দিকে তাকিয়ে নীরবে চোখ মুছছে।

আচমকা চিৎকার শুনে ঝটকা দিয়ে সেদিকে ঘুরে গেল রবিনের চোখ এলোপাতাড়ি দৌড়ানো শুরু করেছে দর্শকরা। চোখে-মুখে আতঙ্ক।

'ভাগো! ভাগো!' চিৎকার করে উঠল একটা ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে 'বাঘ ছুটে গেছে! ঘের থেকে বাঘ বেরিয়ে এসেছে!'

# দুই

কিশোর, রবিন আর মুসার চারপাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে লোকে। বাঘ! বাঘ! পালা! পালা! খেয়ে ফেলল রে!—তীক্ষ্ণ চিৎকার নষ্ট করে দিল বিকেলের শান্ত পরিবেশ।

রিচার্ড বোম্যানকে ছুটে যেতে দেখল রবিন, বাঘটা যেদিকে থাকার কথা সেদিকে। কোমরের বেল্ট থেকে একটা ওয়াকি-টকি খুলে নিয়ে চিৎকার করে হুকুম দিতে শুরু করলেন তিনি।

'জলদি এসো!' কিশোর আর রবিনকে বলল মুসা। 'কি হচ্ছে, দেখে আসি।'

মুসার পেছন পেছন ছুটল দুজনে। দর্শকরা সব ছুটে যাচ্ছে ওদের উল্টোদিকে। আতঙ্কে চিৎকার করছে বেশির ভাগ।

কুগার-পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল মুসা। ঘেরের মধ্যে যে বাঘ দুটোকে অলস ভঙ্গিতে শুয়ে থাকতে দেখেছিল, তার একটা এখন দাঁড়িয়ে আছে ঘেরের বাইরে রাস্তার ওপর। তারমানে বাঘ বেরোনোর খবরটা মিথ্যে নয়। সত্যি সত্যি বেরিয়েছে।

বাঘের কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছেন বোম্যান। মোলায়েম স্বরে, নিচু গলায় কথা বলে শান্ত রাখার চেষ্টা করছেন বাঘটাকে।

দাঁড়িয়ে আছে বাঘটা। বোম্যানের ওপর দৃষ্টি স্থির। দ্বিধায় পড়ে গেছে। অনিশ্চিত ভাবভঙ্গি। কোথায় যাবে, কি করবে যেন বুঝতে পারছে না।

জায়গাটা পুরো জনশূন্য হয়ে গেছে। বোম্যান আর তিন গোয়েন্দা ছাড়া কেউ নেই। রবিন দেখল, অন্য বাঘটা আগের জায়গাতেই ঘুমিয়ে আছে।

এগিয়ে গেল কিশোর। 'আমরা কোন সাহায্য করতে পারি?'

ফিরে তাকালেন বোম্যান। মুসাকে চিনলেন। জু-ইনটার্ন। 'দুজন লক্ষ রাখো দর্শকরা যাতে এদিকে না আসে। আরেকজন এসো, বাঘটার ওপর নজর রাখতে সাহায্য করো আমাকে।'

দুই সহকারীকে ইশারা করে বোম্যানের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর, বাঘের ওপর নজর রাখার জন্যে। দর্শকদের দিকে ফিরে তাকাল মুসা আর রবিন। খবরের কাগজের এক ফটোগ্রাফারকে আসতে দেখে এগিয়ে গেল রবিন, 'আসবেন না, আসবেন না! ওখানেই থাকুন!'

ওদিকে বোম্যানের কাছে কিশোর গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে থাকো, যেন কিছুই ঘটেনি। বাঘটাকে কিছু বুঝতে দিয়ো

না।'

'ঠিক আছে,' বাঘের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে কথা শুরু করল কিশোর। 'আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, চিড়িয়াখানার বাঘ কি মানুষকে আক্রমণ করে?'

'সাধারণত করে না।' বাঘটার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলিস?'

তাঁর প্রশ্নের জবাবে মৃদু গরগর করল বাঘটা।

বাঘের চেহারাটা যত ভয়ঙ্করই হোক, কিশোর লক্ষ করল, ওটার গোঁফ আর লেজ একেবারেই সাধারণ বিড়ালের মত। কেবল আকারে বড়, আর রঙটা একটু অন্য রকম।

'বেড়াল গোষ্ঠীর বড় বড় প্রাণীরা অকারণে কোন প্রাণীই মারে না, ওদের প্রধান খাবার হরিণও না,' বোম্যান বললেন। 'সাংঘাতিক অলস হয় এরা। শুধু খাবারের প্রয়োজন কিংবা নিজের এলাকা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখলেই হামলা চালায়। এখানে কিছু বলছে না বটে, ওটার সীমানার মধ্যে ঢুকে দেখো, ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার ওপর।'

হলুদ চোখজোড়া কিশোরের ওপর স্থির হলো বাঘটার।

'কি খবর রে, বাঘ?' বোম্যানের মত শান্ত, মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করল কিশোর। চিড়িয়াখানার একটা সবুজ জীপ রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বাঘটার পেছনে।

'চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বলতে থাকো,' ফিসফিস করে কিশোরকে বললেন বোম্যান। 'পেছন দিকে তাকানোর কথা যেন না ভাবে। কি ঘটছে দেখতে দিতে চাই না।'

'শুনলি তো, বোম্যান কি বললেন?' বাঘটাকে বলল কিশোর। 'তোরা নাকি মানুষকে আক্রমণ করিস না। বোকামি করে ফেলে জাতের বদনাম করিস না, দেখিস।'

থামল জীপটা। চিড়িয়াখানার হালকা-সবুজ ইউনিফর্ম পরা দুজন লোক নামল। একজনের হাতে রাইফেল, আরেকজনের হাতে তিন ফুট লম্বা একটা তামার সরু নল।

'নোড়ো না,' কিশোরকে নির্দেশ দিলেন বোম্যান, 'একদম চুপ। ব্লোগান দিয়ে এখন ডার্ট ছুঁড়বে ওরা। কড়া ঘুমের ওষুধ ভরা আছে ডার্টের মধ্যে। বিশ মিনিটের জন্যে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যাবে বাঘটার।'

আড়চোখে তাকিয়ে আছে কিশোর। পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে নলওয়ালা লোকটা। বাঘের পেছনে এসে থামল। মুখে তুলল নলটা। বাঘকে সই করে জোরে এক ফুঁ দিল। কমলা রঙের পুচ্ছওয়ালা একটা ডার্ট এসে বিঁধে গেল বাঘের চামড়ায়।

ঘাঁই করে চাপা গর্জন করে উঠল বাঘটা। মুখ হাঁ করতেই বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ দুটো শ্বদন্ত। কিশোরের দিকে তাকিয়ে গরগর করতে লাগল। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। চোখে আগুন। ওকে ব্যথা দেয়ার জন্যে কিশোরকেই দায়ী করে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করল তার ওপর।

দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হচ্ছে না আর তার। দু'তিন সেকেন্ড দেরি হলে কি ঘটত

জানে না, হয়তো দৌড়ই দিয়ে বসত। কিন্তু তার ভাগ্য ভাল, বাঘের রক্তে কাজ শুরু করে দিয়েছে ওষুধ। পা ভাঁজ হয়ে ধসে পড়ল যেন বাঘটা। মাটিতে থুতনি রেখে চোখ বুজল।

'উফ্, বাঁচা গেল!' পা দুর্বল লাগছে কিশোরের। তার মনে হলো বাঘটার মত সে-ও পড়ে যাবে।

বাঘটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন বোম্যান। গায়ে হাত রেখে বললেন, 'গেছে।'

রাইফেল আর ডার্টগান রেখে জীপ থেকে স্ট্রেচার নামিয়ে আনল লোক দুজন। বাঘটাকে স্ট্রেচারে তুলতে ওদের সাহায্য করলেন বোম্যান। জীপে তুলে দিলেন স্ট্রেচারটা। ে ক দুজন উঠল। মুহূর্ত পরেই চলতে শুরু করল জীপ।

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল কিছু দর্শক আর উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছিল চিড়িয়াখানার কর্মচারী। হাঁপ ছাড়ল ওরা।

দৌড়ে এল খবরের কাগজের এক রিপোর্টার। বোম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটেছে কিছু বলতে পারবেন?'

'না,' হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর মত লোকটাকে তাড়াতে চাইলেন বোম্যান। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরলেন। 'অনেক সাহায্য করেছ, থ্যাংক ইউ। তবে এই বিপদে ঢোকা উচিত হয়নি তোমাদের...'

'বিপদ আর কি,' হেসে বলল মুসা। 'আমাকে তো ঢুকতেই হত, কারণ আমি চিড়িয়াখানার ভলান্টিয়ার।' কিশোর ও রবিনকে দেখিয়ে বলল, 'আর বিপদ দেখলে এগিয়ে আসা এদের দুজনের স্বভাব। বাঘের চেয়ে অনেক বড় বড় বিপদকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এসেছে ওরা।'

'তাই নাকি?' হাসলেন বোম্যান। কিশোরের মনে হলো, মুসার কথা বিশ্বাস করেননি তিনি, কিংবা রসিকতা ভেবেছেন।

দুই বন্ধুর দিকে তাকাল মুসা, 'আমাকে এখন একটা উটের সেবা করতে যেতে হবে। পরে দেখা হবে।'

দৌড়ে চলে গেল মুসা। বোম্যানের সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ঘেরের রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন। অন্য বাঘটা এখনও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে ভেতরে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘেরটা দেখতে লাগল কিশোর। কয়েক সেকেন্ড পর বিড়বিড় করে বলল, 'ও, এই তাহলে ব্যাপার!' গাছের মোটা একটা ডাল লম্বালম্বি পড়ে থাকতে দেখল পরিখার ওপর। ব্রিজ তৈরি করেছে ডালটা। ওটা বেয়ে হেঁটে পরিখা পার হয়ে চলে এসেছিল বাঘটা, তারপর লাফ দিয়ে রেলিঙ টপকানো কোন ব্যাপারই ছিল না।

বোম্যানের চোখেও পড়েছে ডালটা। 'সরিয়ে ফেলা দরকার। নইলে ওই বাঘটাও বেরিয়ে চলে আসবে।' গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন তিনি। দৌড়ে এল চিড়িয়াখানার দুজন কর্মচারী। গাছটা দেখিয়ে ওদের সরাতে বললেন।

লম্বা লম্বা লোহার পাইপ নিয়ে এল লোকগুলো, ডালটা ঠেলে সরানোর জন্যে।

রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে দিল রবিন। ভালমত দেখল ডালটা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিশোরের দিকে তাকাল। চিন্তিত ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল কিশোর।

সে যা ভাবছে, রবিনও তাই ভাবছে।

'ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না,' ঘোষণা করল কিশোর।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন বোম্যান, 'কী!'

'ওই দেখুন,' ডালের গোড়ার দিকটা পড়েছে রেলিঙের দিকে। 'করাত দিয়ে কেটে রাখা হয়েছে অনেকখানি। ডালের ওদিকের মাথাটা দেখুন, দড়ি বাঁধা রয়েছে এখনও।'

'গত রাতে কিংবা তার আগের রাতে, কিংবা আরও আগে কেটে রেখেছে ডালটা কেউ,' কিশোর বলল। 'আগায় দড়ি বেঁধে তৈরি করে রেখেছিল।'

'তারপর সুযোগমত,' কিশোরের বক্তব্যটা শেষ করল রবিন, 'দড়ি ধরে দিয়েছে টান। গত আধঘণ্টার মধ্যে কোন সময় করেছে অকাজটা। ওর নিশ্চয় জানা ছিল, আজকের এই সময়টায় বেশির ভাগ দর্শক গিয়ে জমা হবে মঞ্চের কাছে, তুষার চিতা দেখার জন্যে।'

দুজনের দিকে তাকিয়ে আছেন বোম্যান। 'গোয়েন্দা নাকি তোমরা?'

চট করে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। বোম্যানের দিকে ফিরে আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল।

'ও!' দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আবার ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। 'মুসা যখন বলল, বিপদ দেখলে এগিয়ে যাওয়া তোমাদের স্বভাব, আমি ভেবেছি রসিকতা করছে।...আমি অফিসে যাচ্ছি। এসো না, হাঁটতে হাঁটতেই কয়েকটা কথা বলি।'

'কার কাজ, কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?' বোম্যানকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'না,' মাথা নাড়লেন বোম্যান। 'এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম নয়। মাসখানেক আগে দুটো বানর বেরিয়ে গিয়েছিল। হপ্তা দুই আগে একটা অজগর।...চলো, কোন্‌খানে, দেখিয়েই নিয়ে আসি।'

খানিকটা ঘুরপথে এগিয়ে জাপানী ম্যাকাকু বানরের ঘেরের কাছে কিশোরদের নিয়ে এলেন বোম্যান। পাথরের একটা দ্বীপ তৈরি করা হয়েছে, তাতে কিছু গাছপালা। দ্বীপ ঘিরে পরিখা, পানিতে ভর্তি। খেলা করছে বানরের দল। তীব্র গতিতে পাথরের ওপর দিয়ে গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা বানর। ঘন, ধূসর রোমশ গা; লাল মুখটা দেখতে প্রায় মানুষের মত।

দ্বীপের পেছনে তারের বেড়া। তার ওপাশে ঘন গাছপালা। বেড়াটা দেখিয়ে বোম্যান বললেন, 'ওটা না থাকলে বেরিয়ে চলে যেত সবগুলো বানর। ওটাতে খুব অল্প ভোল্টেজের বিদ্যুৎ বইছে। বেড়া ধরে বেয়ে উঠতে গেলেই ইলেকট্রিক শক খায় বলে আর ওদিকে যেতে চায় না। মাসখানেক আগে দুটো বানর বেরিয়ে গেলে পরীক্ষা করে দেখা গেল বেড়া কাটা।'

বেড়াটা দেখল কিশোর। অনেক উঁচু। মই দিয়ে উঠেও নাগাল পাওয়া কঠিন।

কয়েক মিনিট পর, কিছুদূরের একটা লাল ইঁটের সুন্দর বাড়ির কাছে ওদের নিয়ে এলেন বোম্যান। 'এটা সাপের ঘর। সামনের দিকে কাঁচের বেড়া দেয়া ছোট ছোট ঘরের মধ্যে সাপ রাখা হয়, দেখেছ নিশ্চয়।'

'সাপের ঘরে বেড়া দিয়ে রাখাই ভাল,' হেসে বলল রবিন। 'বিষাক্ত ওই প্রাণীগুলোকে প্রচণ্ড ভয় পাই আমি।'

'ওই দেখো, এয়ার ভেন্ট,' ড্রেন পাইপের ওপরে বাতাস বেরোনোর ধাতব এয়ার ভেন্টটা দেখালেন বোম্যান। 'সাপের ঘরগুলো সব তাপ নিরোধক। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। বিল্ডিঙের ভেতরে তাই ভেন্ট লাগানো হয়েছে। সেদিন ওই ভেন্ট খুলে দিয়েছিল কে যেন। অজগর সাপের খাঁচার কাছে।'

'বাতাস বেরোনোর নলের ভেতর দিয়ে তখন বেরিয়ে গিয়েছিল সাপটা,' কিশোর বলল, 'তাই তো?'

মাথা ঝাঁকালেন বোম্যান। 'ওয়াকি-টকিতে আমাকে জানানো হলো, রাস্তা দিয়ে একটা অজগর যাচ্ছে। বিষাক্ত সাপ নয়। ভয়ে চেঁচানো শুরু করেছিল তবু অনেক দর্শক

'এর মধ্যে আজকের ঘটনাটাই ছিল তাহলে সবচেয়ে বিপজ্জনক,' রবিন বলল। 'খাঁচা থেকে বাঘ বের করে দেয়াটা ছেলেখেলা নয়।'

মাথা ঝাঁকালেন বোম্যান, 'হ্যাঁ।'

'প্রতিটি ক্ষেত্রেই মনে হচ্ছে,' অনুমান করল কিশোর, 'অফ টাইমে কারসাজিগুলো করে রাখা হয়, যখন দর্শক থাকে না। নইলে কারও না কারও চোখে পড়ে যেত। কারসাজি করে রাখে এমনভাবে, যাতে দর্শক আসার পর বেরোয় প্রাণীগুলো।'

'সিকিউরিটি গার্ড আছে আমাদের,' বোম্যান জানালেন। 'অফ টাইমেও পাহারা দেয়। তবে বিরাট এলাকা। সবখানে সব সময় নজর দিতে পারে না প্রহরীরা। চুরি করে ঢুকে কারও পক্ষে অকাজ সেরে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়।'

'কিংবা হয়তো প্রহরীদেরই কেউ কাজটা করছে,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, তা-ও হতে পারে। এটাই সমস্যা। যে কেউ করে থাকতে পারে। কার কাজ, আমিও বুঝতে পারছি না, পুলিশও পারছে না।'

জু প্লাজায় দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে এলেন বোম্যান। পাকা চত্বর ঘিরে ফুলের কেয়ারি। তার ওপাশে পাতাবাহারের বেড়া। চত্বরের মাঝখানে একটা ফোয়ারা। পাথরের সীলমাছের মুখ থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে পানি।

আরেকটা লাল ইঁটের বাড়ি দেখিয়ে বোম্যান বললেন, 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং, আমার অফিস।' বিল্ডিঙের সামনে একটা পুলিশের গাড়ি দেখা গেল। 'ও, এসে গেছে ওরা। যাই, আমাদের সিকিউরিটি হেডকে নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।...তা, সব তো শুনলে। সাহায্য করো না আমাদের। করবে?'

'করব,' জবাব দিল কিশোর।

'তবে এ মুহূর্তে আপনাদের আলোচনায় থাকতে পারছি না আমরা,' রবিন বলল। 'একটা জিনিস দেখতে যেতে হবে। আচ্ছা, তুষার চিতা দেখানোর সময় ওখানে দুজন প্রতিবাদীকে দেখেছিলাম। কিছু জানেন নাকি ওদের ব্যাপারে?'

'ও, ওরা। লোকটার নাম নিক ওয়ালথ্রপ। মহিলা তার স্ত্রী, রায়না। প্রাণীর অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছে। দু'তিন মাস ধরে দেখছি। চিড়িয়াখানায় ঢুকে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এটা পাবলিকের জায়গা, জোর করে ওদের বেরও করে দিতে পারি না। চিড়িয়াখানা করার বিপক্ষে ওরা।' একটা মুহূর্ত থেমে বললেন বোম্যান, 'কিন্তু তাই বলে চিড়িয়াখানার জানোয়ার খাঁচা থেকে বের করে দেয়ার মত

কোন অপরাধ করবে বলে মনে হয় না।'

পরে আলাপ করবে—বোম্যানকে কথা দিয়ে, ওয়ালথ্রপরা কি করে দেখতে চলল দুই গোয়েন্দা।

পার্কিং লটে পুস্তিকা বিতরণ করছে তখন দুই প্রতিবাদী। সাইন দুটো ল্যাম্প পোস্টে ঠেস দিয়ে রাখা।

'জানোয়ারগুলোকে মুক্তি দাও' লেখা সাইনটার দিকে তাকাল রবিন। পুস্তিকা হাতে এক বৃদ্ধার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন রায়না।

'চিড়িয়াখানা জন্তু-জানোয়ারের জায়গা নয়,' বৃদ্ধাকে বোঝাচ্ছে রায়না। একটা পুস্তিকা গুঁজে দিল হাতে। 'ভেতরে ঢোকার আগে দয়া করে এটা পড়ে দেখুন।'

দুটো টিনেজ ছেলেমেয়েকে পাকড়াও করেছে নিক। তার স্ত্রীর মত একই সুরে কথা বলল, 'ভেতরে ঢোকার আগে দয়া করে এটা পড়ুন।'

চিড়িয়াখানা দেখতে পারে না ওয়ালথ্রপ দম্পতি, বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার।

দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কিশোর আর রবিন। নিকের লালচে দাড়ি। মাথার লম্বা চুল ঘোড়ার লেজের মত করে পেছন দিকে বাঁধা। রায়নার চুল সোনালি। খাটো করে ছাঁটা। দুজনেরই ছিপছিপে গড়ন। শক্ত-সমর্থ। বয়েস তিরিশের কোঠায়। দুজনের গায়েই টি-শার্ট, বুকে প্রিন্ট করে লেখা এ.আর.এফ।

গলায় ক্যামেরা ঝোলানো একজন লোক এগিয়ে গেল ওয়ালথ্রপদের দিকে। 'চিড়িয়াখানার মধ্যে গণ্ডগোল করছেন কেন? আমি তো জানি জন্তু-জানোয়ারের ভাল যত্ন নেয় রকি বীচ চিড়িয়াখানা।'

বোঝানোর চেষ্টা করল রায়না, 'বনের মধ্যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে আরও অনেক ভাল থাকে ওরা। কারও দেখতে ইচ্ছে করলে ওখানে গিয়েই দেখুক না। শুধু শুধু খাঁচায় বন্দি করে রেখে বেচারাদের কষ্ট দেয়া কেন? আপনাকে যদি বন্দি করে রেখে মজার মজার খাবার দেয়া হয় সেটা কি ভাল লাগবে?'

প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেল লোকটা। 'কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে গিয়ে দেখার অনেক ঝামেলা, অনেক খরচ। আমিই তো পারব না।'

'তাহলে আপনার দেখারও দরকার নেই, যার ক্ষমতা আছে সে-ই দেখবে,' স্ত্রীর মত স্বর অত নরম করল না নিক। ক্যামেরাওয়ালার বেল্টের দিকে হাত তুলে বলল, 'পরেছেন তো কুমিরের চামড়ার বেল্ট। আপনাদের মত অতি সৌখিনদের জন্যেই প্রশ্রয় পাচ্ছে চোরা-শিকারীরা, প্রাণ দিতে হচ্ছে হতভাগ্য প্রাণীগুলোকে।'

তর্ক শুনে ঘিরে দাঁড়াল কয়েকজন।

'এই গোঁড়াদের সঙ্গে কে কথা বলে!' রেগে উঠল ক্যামেরাওয়ালা। 'অকারণে গোলমাল করতে এসেছেন পাবলিকের জায়গায়।'

'দেখুন মিস্টার,' নিকও রেগে গেল, 'কথাবার্তা সাবধানে বলবেন! গোলমাল তো আপনারা করেন। জন্তু-জানোয়ারের বদলে আপনাদের মত জীবদের ধরেই খাঁচায় ভরা উচিত।'

'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!' গর্জে উঠল ক্যামেরাওয়ালা।

'কি করবেন?' লোকটার বুকে এক ধাক্কা মারল নিক। 'করবেন কি, শুনি?'

'খবরদার!' চিৎকার করে উঠল ক্যামেরাওয়ালা।

নিকের মাথা গরম, অল্পতে রেগে যায়, বুঝতে পারল কিশোর।

ক্যামেরাওয়ালাও কম যায় না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখা গেল মারপিটের ভঙ্গিতে একজন আরেকজনকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করেছে। হঠাৎ ঘুসি বাগিয়ে ছুটে গেল নিক।

জলদি ওদের ঠেকানো দরকার। নইলে সত্যি সত্যি একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে দুজনে।

## তিন

'দাঁড়ান, দাঁড়ান!' দৌড়ে গিয়ে নিকের হাত চেপে ধরল কিশোর। 'করছেন কি? ঝগড়া করে আন্দোলন এগোতে পারবেন না। সহিংসতা পছন্দ করে না লোকে।'

রবিনও এসে দাঁড়াল কিশোরের পাশে।

ফিরে তাকাল নিক। চোখ-মুখ লাল।

'ও ঠিকই বলেছে,' রায়না বলল। 'ছাড়ো ওকে। ছেড়ে দাও।'

ঘুসি নামাল নিক।

'জংলি কোথাকার!' ভ্রূকুটি করল ক্যামেরাওয়ালা। 'সত্যি সত্যি পাগল এগুলো। চিড়িয়াখানা দেখতে দেবে না, হুঁহ!' টিকিট কেনার জন্যে গটমট করে এগিয়ে গেল খড়ের ছাউনি দেয়া টিকিট-কুঁড়ের দিকে।

কিশোরের দিকে তাকাল নিক, 'থ্যাংক ইউ। আমাকে থামিয়ে দিয়ে ভাল করেছ। মাঝে মাঝে আমার কি যে হয়ে যায়, নিজেকে সামলাতে পারি না।'

'বড় কঠিন একটা কাজে হাত দিয়েছেন, এর জন্যে প্রচুর ধৈর্য দরকার,' কিশোর বলল। 'মানুষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তার ধারণা পরিবর্তন করা সোজা কথা না।'

'হোক কঠিন, হাল আমি ছাড়ব না,' কিশোরের হাতে একটা পুস্তিকা ধরিয়ে দিল নিক। 'আমি আর আমার স্ত্রী মিলে ছোট্ট একটা প্রতিষ্ঠান চালু করেছি, নাম দিয়েছি এ.আর.এফ, অর্থাৎ অ্যানিমেল রাইটস ফোর্স। আমরা জন্তু-জানোয়ারের নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা করছি।'

'জন্তু-জানোয়ারের নাগরিক অধিকার!' লোকটাকে পাগলই মনে হলো রবিনের।

'এখন নেই বটে,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রায়নার কণ্ঠ, 'তবে থাকা উচিত। সুযোগ মত আমাদের পুস্তিকা পড়ে দেখো, বুঝতে পারবে।'

'পড়ব,' পুস্তিকাটার দিকে তাকাল কিশোর।

'এসো,' স্বামীর হাত ধরে টান দিল রায়না। 'একদিনের জন্যে যথেষ্ট প্রতিবাদ করা হয়েছে। চলো, বাড়ি যাই। পথে বাজার থেকে কিছু তাজা শাক-সব্জি কিনে নিতে হবে।'

সাইন দুটো তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল দুজনে। বাস স্টপেজে গিয়ে দাঁড়াল। কিশোরের দিকে চোখ ফেরাল রবিন; 'কি বুঝলে?'

'ওদের ওপর নজর রাখা দরকার,' কিশোর বলল। 'চিড়িয়াখানার জানোয়ার ছেড়ে দেয়ার পেছনে ওদের মোটিভ পরিষ্কার। আপাতত, চলো, আবার চিড়িয়াখানাটা ঘুরে দেখি।'

'চলো। সূত্র খুঁজি। জানোয়ারগুলোকে ছাড়ার সময় কিছু ফেলে যেতেও পারে।'

পরের একটি ঘণ্টা চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াল দুই গোয়েন্দা। তীক্ষ্ণ নজর রাখল সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখার জন্যে। মনে মনে আরও একবার স্বীকার করতে বাধ্য হলো রবিন, খুবই সুন্দর ভাবে রাখা হয়েছে চিড়িয়াখানাটা। দারুণ একটা পার্ক।

চিড়িয়াখানার বেশির ভাগটাই দেখা হয়ে গেল। অস্বাভাবিক কোন কিছু চোখে পড়ল না।

মাটিতে লম্বা নাক নামিয়ে কি যেন খুঁজছে একটা আরডাভার্ক। সেদিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'মুসার কাছে যাই। এতক্ষণে উটের সেবা হয়ে গেছে নিশ্চয়।'

আফ্রিকান সমভূমির ওপর দিয়ে কোনাকুনি রওনা হলো ওরা। মাথার ওপর একটা মনোরেল চলছে।

'ওতে চড়ে চিড়িয়াখানা দেখাটা দারুণ উপভোগ্য হবে,' রবিন বলল। 'চড়ব নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'চড়ব। এখন না। পরে।'

তুষার চিতার ঘেরের পেছনে মুসাকে দেখতে পেল ওরা। ভাল ভিড় জমেছে। উটের সেবা শেষ তার। কথা বলছে রাজকুমারী চন্দ্রাবতীর সঙ্গে।

'এই যে, এসে গেছে,' ওদের দেখে বলে উঠল মুসা। 'প্রিন্সেস, আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিই। ও কিশোর পাশা, আর ও রবিন মিলফোর্ড।'

যতই আধুনিক হোক, আমেরিকায় আসুক, হাত মেলানো পছন্দ করে না ভারতের অনেক মেয়ে। হাত তুলে সালাম জানাল তাই কিশোর।

বাউ করার ভঙ্গিতে সামান্য মাথা নোয়াল রবিন।

'বাউ করছ কেন? এ সব রাজকীয় কায়দা-কানুন আমার পছন্দ না,' উষ্ণ আন্তরিক কণ্ঠে বলল রাজকুমারী। হাত দিয়ে ডলে শাড়ির আঁচল সমান করল। মুসার হাতের মিষ্টি দেয়া ক্র্যাকার জ্যাক পপকর্নের বাক্স দেখিয়ে বলল, 'আমাকে একটু দেবে?'

সঙ্গে সঙ্গে বাক্সটা বাড়িয়ে দিল মুসা, 'নিন।'

'কান্‌ঝার নাম এই প্রথম শুনলাম,' কিশোর বলল।

'অনেকেই শোনেনি,' ক্র্যাকার জ্যাক চিবুতে চিবুতে জবাব দিল রাজকুমারী। 'খুব ছোট্ট রাজ্য। খুদে।...হুঁ, সত্যি ভাল স্বাদ। তোমার রুচি খুব ভাল, মুসা।'

'আপনার বাবা কি ওখানকার রাজা?' জানতে চাইল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল চন্দ্রাবতী, 'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা নামকা ওয়াস্তে। রাজা একজন থাকা দরকার, আছে। কান্‌ঝায় এখন গণতন্ত্র। তবু প্যারেড, ডাক টিকিট আর কিছু কিছু জায়গায় এখনও রাজ পরিবারের মানুষকে দেখতে চায় লোকে।...আপনি আপনি

করছ কেন আমাকে? তুমি করে বলো।'

'থ্যাংক ইউ...'

উচ্চকিত হাসি শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। দুটো ছোট ছেলে ঘাসের মধ্যে ডিগবাজি খাচ্ছে। খানিক দূরে আরেকটা আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে বড় একটা ওক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

নজর দিত না কিশোর। কিন্তু মনে হলো ছেলেটা ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। ভাল করে দেখে বুঝল, না, ওকে নয়, রাজকুমারীকে দেখছে। অস্বাভাবিক কিছু না। দেখবেই। রকি বীচে রাজকুমারী গণ্ডায় গণ্ডায় আসে না।

'আমেরিকায় পড়তে এলে কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ভারতে তো স্কুল-কলেজের অভাব নেই।'

'সারা পৃথিবীর কাছেই আমেরিকা এখন একটা বিস্ময়, এখানে আসার লোভ ছাড়তে পারে না। আমার এক খালাত ভাই রকি বীচে পড়ছে। তার মুখে প্রশংসা শুনতে শুনতে আমিও আর না এসে থাকতে পারলাম না।' হাত বাড়াল চন্দ্রাবতী, 'মুসা, দাও তো আরেকটু। সত্যি চমৎকার।'

আচমকা তীক্ষ্ণ এক চিৎকার শুনে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। কোথা থেকে শব্দটা এল দেখতে চাইছে।

'কান্তা ডাকছে,' হাত তুলে ঘেরটা দেখাল রাজকুমারী। রেলিঙের ওপাশে, পরিখার ওপারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিতাটাকে। সবুজ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে মনিবের দিকে। চন্দ্রাবতীর লাল শাড়ির টুকরোটা ওর এক পায়ে পেঁচানো। 'একমাত্র তুষার চিতাই এ রকম শব্দ করতে পারে।'

'কি চায়?' মুসার প্রশ্ন।

'আমার দৃষ্টি আকর্ষণ,' মৃদু হেসে বলল রাজকুমারী। 'মাঝে মাঝে এত জেলাস হয়ে ওঠে...' চিতাটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বিচিত্র, দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলল। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে জবাব দিল কান্তা।

রবিন অবাক। তার মনে হলো, সত্যি সত্যি কথা হচ্ছে জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে। চিতাটার অপূর্ব সুন্দর চামড়ার দিকে তাকিয়ে থেকে রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করল সে, 'তোমার দেশে কি তুষার চিতা পাওয়া যায়?'

'ঠিক আমাদের রাজ্যে নয়, তবে কাছেই পাওয়া যায়। হিমালয়ের পার্বত্য এলাকায়। অনেক উঁচুতে, বরফে ঢাকা অঞ্চলে বাস করে তুষার চিতা। মানুষ তো থাকেই না এত ওপরে, আর কোন জন্তু-জানোয়ারেরও বাস নেই। খুব নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করে এরা। আমার সঙ্গে মিল আছে।'

কি মনে করে ফিরে তাকাল কিশোর। এখনও গাছের নিচে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। এদিকেই নজর। পরনে আমেরিকান পোশাক। কিন্তু ওর কালো চুল আর চামড়ার রঙ চন্দ্রাবতীর মত।

ছেলেটার চাহনি ভাল লাগল না কিশোরের। সতর্ক হয়ে উঠল তার সন্দেহপ্রবণ মন।

'দেশে থাকতে কোথায় রাখতে চিতাটাকে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'রাতে আমার ঘরে, আমার বিছানার নিচে পায়ের কাছে শুয়ে থাকত,'

রাজকুমারী জানাল। 'কিন্তু দেখতে দেখতে এতবড় হয়ে গেল, ঘরে রাখাটা কঠিন হয়ে গেল। ওর বাড়ির কাছে পাহাড়েই ছেড়ে দিয়ে আসার কথা ভেবেছি। কিন্তু কোন জানোয়ার শিশুকাল থেকে একবার পোষা হয়ে গেলে বুনো এলাকায় আর টিকতে পারে না। বুনো পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না কোনমতেই। না খেয়ে মরে শেষে। তাই আমেরিকাতে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এখানেও সঙ্গে রাখতে পারলাম না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে শেষে চিড়িয়াখানায় দিয়ে দেয়াই ভাল মনে করলাম। রোজ সকালে একবার করে দেখে যেতে হবে ওকে।'

দুচোখ ভরা ভালবাসা নিয়ে চিতাটার দিকে তাকিয়ে আছে চন্দ্রাবতী। চিতাটাও তার থাবায় পেঁচানো শাড়ির কাপড় শুঁকছে বার বার।

'এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে বরং হাঁটাহাঁটি করি,' আচমকা ঝটকা দিয়ে চিতাটার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল রাজকুমারী। মন সরানোর চেষ্টা করছে। 'কি সুন্দর বিকেল।' রসিকতা করল, 'হাঁটতে গেলে আবার গণ্ডারের সামনে পড়ব না তো?'

হাসতে গিয়ে মুসার গলায় পপকর্ন আটকে গেল। বের করার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল। হেসে ফেলল চন্দ্রাবতী। ফিরে তাকাল কিশোর। ওক গাছের নিচ থেকে উধাও হয়েছে রহস্যময় তরুণ।

ছায়াঢাকা একটা হাঁটাপথ ধরে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে এগিয়ে চলল রাজকুমারী।

'ভাল কথা,' হাঁটতে হাঁটতে রবিন বলল, 'মুসা, তুমি জানো, আরও দুবার খাঁচা থেকে জানোয়ার ছুটে গিয়েছিল?'

'জানি। কেন?'

'মিস্টার বোম্যানের কাছে শুনলাম, ব্যাপারটা নাকি সন্দেহজনক। অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না ওগুলো। জানোয়ারগুলোকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছে কেউ, আজকের বাঘটার মত। প্রশ্ন হলো: কে, এবং কেন?'

'এখন পর্যন্ত অবশ্য কোন অঘটন ঘটেনি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু এ ভাবে বেরোতে থাকলে ঘটে যেতে কতক্ষণ!'

'তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে,' রবিন আর কিশোরের দিকে তাকাতে লাগল মুসা, 'আরেকটা কেস পেয়ে গেছি?'

'কেস?' ভুরু উঁচু করল চন্দ্রাবতী। 'পুলিশের লোক নাকি তোমরা? জুনিয়র পুলিশ?'

হাসল মুসা, 'পুলিশ নই। গোয়েন্দা। শখের গোয়েন্দা।'

'গোয়েন্দা! কি সাংঘাতিক!'

'আস্তে, আস্তে!' তাড়াতাড়ি হাত তুলে বাধা দিল রবিন। 'চিড়িয়াখানার সবাইকে শুনিয়ে দেবে নাকি।'

'না না, শোনাব না···' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল চন্দ্রাবতী।

সরু খালের ওপর একটা ব্রিজ আছে। খালের এক মাথা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা পুকুরে। ব্রিজ পেরোনোর সময় মুসাকে বলল কিশোর, 'চিড়িয়াখানায় তুমি কাজ নেয়াতে ভাল হয়েছে আমাদের জন্যে। তদন্তের সুবিধে হবে। গত কয়েক মাসে অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়েছিল নাকি তোমার?'

'মনে করতে পারছি না,' মুসা বলল।

পুকুরের পানিতে ভেসে থাকা নানা রকম হাঁস দেখার জন্যে থামল দলটা।

'চিড়িয়াখানার এমন কোন কর্মচারীর কথা জানো, কোন্ কারণে যে চিড়িয়াখানার ওপর ক্ষুব্ধ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হাঁসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা বলে উঠল মুসা, 'ডক্টর হেমিং। প্রাইমেট কিউরেটর।'

'আমি তো জানতাম,' আবার হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন, 'কিউরেটর থাকে মিউজিয়ামের। চিড়িয়াখানায় কিউরেটরের কি দরকার?'

'এ কিউরেটর সে-কিউরেটর নয়,' মুসা বলল। 'কীপাররা জন্তু-জানোয়ারের দেখাশোনা করে, সেবাযত্ন করে; আর কিউরেটররা মনোযোগ দেয় কোন বিশেষ একটা প্রজাতির ওপর। ডক্টর হেমিং আছেন প্রাইমেটদের দায়িত্বে। বানর থেকে শুরু করে শিম্পাঞ্জি, গরিলা—মোটকথা বানর জাতীয় সমস্ত প্রাণীর ভার তাঁর ওপর।'

'তিনি ক্ষুব্ধ, এ কথা কেন মনে হলো তোমার?' জানতে চাইল কিশোর।

'শিম্পাঞ্জি নিয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়ে গেছেন তিনি,' মুসা বলল। 'একদিন তাঁর ল্যাবরেটরিতে শিম্পাঞ্জির খোঁয়াড় মেরামতে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। তাঁকে অভিযোগ করতে শুনলাম, চিড়িয়াখানার ট্রাস্টি বোর্ড সমস্ত টাকা একটা বিশেষ এগজিবিটের ওপর খরচ করতে চায়।'

'তাতে অসুবিধেটা কি?'

'শিম্পাঞ্জিদের ওপর সরেজমিনে একটা গবেষণা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ডক্টর হেমিং।'

কিছুক্ষণ আগে যে হাতিটার সেবা করে এসেছে মুসা, গিনি, সেটার কাছে এসে দেখা গেল কলাগাছ খাচ্ছে।

'চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ গবেষণার জন্যে বরাদ্দ করা টাকা কেটে নিয়ে নতুন এই প্রদর্শনীতে খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,' মুসা বলল, 'যেটা আহত করেছে ডক্টর হেমিংকে। রীতিমত খেপে উঠেছেন তিনি। খবরটা শোনার পর হাতের সামনের সমস্ত ফাইল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন মেঝেতে।'

'ইনটারেসটিং!' চন্দ্রাবতী বলল। 'আমেরিকান টিভির নাটকের মত।'

'কবের ঘটনা এটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মাসখানেক আগের।'

'এক মাস?' দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'জানোয়ার ছুটে যাওয়ার ঘটনাটা তখনই প্রথম ঘটেছিল না?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'তাহলে তো ডক্টর হেমিঙের সঙ্গে একবার দেখা করতে হয়।' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'কি বলো?'

উহ্ করে উঠল রবিন।

'কি হলো?'

'পিঠে কি যেন লাগল!'

'কই কিছু তো...' কথা শেষ হলো না কিশোরের। থ্যাপ করে তার গায়েও কি যেন একটা লেগে, মাটিতে পড়ে গড়িয়ে চলে গেল ঝোপের ভেতর। রবিনের মত

উহ্ করে উঠল সে-ও। হাতটা চলে গেল কাঁধের কাছে।

'শুয়ে পড়ো! জলদি শুয়ে পড়ো!' গুলি করা হচ্ছে ভেবে চিৎকার করে উঠল সে।

# চার

উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে মাথা ঘুরিয়ে চন্দ্রাবতীর দিকে তাকাল রবিন।

ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রাজকুমারীর। গুলি খাওয়ার ভয়ে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে সে।

ঝোপের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। হাত বাড়িয়ে বের করে আনল একটা আপেল। রবিনকে দেখিয়ে বলল, 'মনে হয় এটা লেগেছিল।'

হাঁ হয়ে গেল রবিন। বিড়বিড় করল, 'আপেল দিয়ে ঢিল ছুঁড়েছে...' চোখ পড়ল মুসার ওপর। সে শোয়নি। মুখে নীরব হাসি। রবিনের চোখে চোখ পড়তেই হো-হো করে হেসে উঠল।

'হাসার কি হলো?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'তুমি ভেবেছ রাজকুমারীকে কিডন্যাপ করতে এসেছে?' হাসার জন্যে ঠিকমত কথা বলতে পারছে না মুসা। 'মোটেও না। তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে।'

'মানে?' উঠে বসল রবিন। বোকার মত তাকিয়ে রইল মুসার দিকে।

'ওই দেখো, কে তোমাদের ঢিল ছুঁড়েছে,' হা-হা করে হেসে নিল আরেক চোট মুসা।

'কে?' উঠে দাঁড়িয়েছে কিশোর।

'গিনি! গিনি!' পাশের ঘেরটার দিকে হাত তুলল মুসা। 'ঢিল ছুঁড়তে ভালবাসে সে। ওর শুঁড়ের কাছে ছোঁড়ার মত কোন জিনিস রাখি না আমরা। দর্শকরা নিশ্চয় আপেল খেতে দিয়েছিল। সেগুলো ছুঁড়েছে।'

মস্ত ধূসর প্রাণীটার দিকে তাকাল কিশোর। তিরিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে এদিকেই। মনে হলো, হাসছে।

'হাসো, আরও হাসো,' মুসা বলল। 'ওর নখে নেল পলিশ লাগানো নিয়ে হাসাহাসি করেছিলে না। প্রতিশোধ নিয়েছে। ঠিকই মনে রেখেছে ও। হাতিরা সহজে ভোলে না।'

উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ি থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল চন্দ্রাবতী। হাসি চেপে কিশোর আর রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছ তো তোমরা?'

'আছি,' রবিন বলল। 'আস্ত একটা গাধা মনে হচ্ছে নিজেকে।'

আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল আবার কিশোর, 'মুসা, ডক্টর হেমিংকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'ল্যাবরেটরিতেই থাকেন এ সময়, এপ অ্যাভিনিউর কাছে।'

'চলো, আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবে।'

'এখন তো নিশ্চয় খুব ব্যস্ত তিনি। সব সময়ই থাকেন অবশ্য। তা ছাড়া আমাকে বিশেষ পাত্তা দেবেন না, হয়তো ঢুকতেই দেবেন না। এক কাজ করো বরং। মিস্টার বোম্যানকে বলো, তিনি সহজেই দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

'হুঁ।' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'চলো।' মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যাবে না?'

দ্বিধা করে বলল মুসা, 'আমি আর গিয়ে কি করব? তোমরাই যাও। আমি প্রিন্সেসকে অ্যাভিয়ারি দেখাতে নিয়ে যাই। পাখির এলাকা। সুন্দর সুন্দর কুকাবুরা পাখি আনা হয়েছে। দেখাব বলে রেখেছিলাম প্রিন্সেসকে।'

'ঠিক আছে, যাও তাহলে।' রবিনের দিকে ফিরে, 'এসো,' বলে হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

অফিসেই পাওয়া গেল বোম্যানকে। কিশোর জানাল, ডক্টর হেমিঙের সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওরা যে রহস্যের তদন্ত করতে যাচ্ছে, এ কথাটা হেমিংকে না জানানোর অনুরোধ করল।

অবাক হলেন বোম্যান। 'সন্দেহ করছ নাকি তাকে?'

'সন্দেহ করার অবস্থায় আসিনি এখনও। তবে সাবধান থাকা ভাল।'

ডক্টর হেমিংকে ফোন করলেন বোম্যান। বললেন, দুটো ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। ওরা চিড়িয়াখানার ভাল চায়।

বোম্যানকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। সাইনবোর্ড দেখে খুঁজে বের করল এপ অ্যাভিনিউ। একটা বিল্ডিঙে ঢুকে করিডর ধরে এগোল।

'ওই যে, কিং-কঙের বংশধর,' রবিন বলল।

ঘুরে তাকাল কিশোর। রেলিঙের পরে ফাইবারগ্লাসের শিকের ওপাশে কয়েকটা গরিলা দেখতে পেল।

'শরীরটা যেমনই হোক,' কিশোর বলল, 'গরিলারা খুব ভদ্র জানোয়ার। মায়া-দয়া আছে। দেখো না, বাচ্চাটার গা থেকে কেমন কুটো ফেলছে।'

কয়েক মিনিট পর 'রিসার্চ ল্যাব' লেখা একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজায় টোকা দিল কিশোর। মৃদু গুঞ্জন তুলে খুলে গেল স্বয়ংক্রিয় দরজা। মাথার ওপরে উজ্জ্বল স্কাইলাইট লাগানো একটা লম্বা হলঘরে পা রাখল দুই গোয়েন্দা। ঘরের মাঝখানে ফাইবারগ্লাসের শিক লাগিয়ে আলাদা করা। এ পাশের অংশটা প্রায় ভরে রাখা হয়েছে চার্ট, গ্রাফ, বই, ভিডিও আর সাউন্ড ইক্যুইপমেন্ট দিয়ে। একটা ডেস্ক আর কয়েকটা চেয়ার আছে।

একটা চেয়ারে বসে আছেন ডক্টর হেমিং। কোলে একটা শিম্পাঞ্জির বাচ্চা। ফিডার দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন।

বসতে ইশারা করলেন দুই গোয়েন্দাকে। দুধ খাওয়ানো শেষ করে মুখ তুললেন, 'হুঁ। তো, শিম্পাঞ্জির ব্যাপারে আগ্রহী?'

'হ্যাঁ, শিম্পাঞ্জির বন্ধু হতে চাই,' রসিকতা করে বলল রবিন।

ডক্টর হেমিং হাসলেন। হাসিখুশি চেহারা। ধূসর চুলগুলো মাথার পেছনে ছোট খোঁপা করে বেঁধেছেন। পরনে ল্যাবরেটরির সাদা কোট। বয়েস পঞ্চাশের

কাছাকাছি।

'টবি, খাঁচার তালাটা খুলে দেবে?' পাশের অফিসের দিকে তাকিয়ে বললেন ডক্টর হেমিং। শিম্পাঞ্জির বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন শিকগুলোর দিকে।

শিকের ওপাশে ঘরের বাকি অর্ধেকটা তৈরি করা হয়েছে শিম্পাজি রাখার মত করে। একটা নকল গাছ, লম্বা হয়ে বেড়ে থাকা ডাল, সবুজ পাতা, আর দড়িতে বেঁধে ডালে ঝুলিয়ে রাখা একটা টায়ার। এক আলমারি খেলনা, একটা খেলনা কাঠের ঘোড়া আর একটা টেলিভিশন রাখা মেঝেতে।

টায়ারের ওপর বসে আছে একটা শিম্পাঞ্জি। আরেকটা ওটাকে ঠেলছে। বাচ্চাদের দোলনা খেলার মত। ছোট বাচ্চাটার চেয়ে এ দুটো অনেকটা বড়। মহা আনন্দে আছে ওরা।

'জীবনটা নেহায়েত মন্দ না,' বিড়বিড় করল রবিন।

কয়েক সেকেন্ড পর যান্ত্রিক শব্দ শোনা গেল। ডেকে বলল টবি, 'খুলেছি, ডক্টর হেমিং।'

শিকগুলোর মাঝে লাগানো একটা দরজা ঠেলে খুললেন ডক্টর। বাচ্চাটাকে ওপাশে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'যাও, খেলোগে।'

দুই লাফে গিয়ে কৃত্রিম গাছে উঠে পড়ল বাচ্চাটা। ডাল ধরে ঝুলে ঝুলে নানা কসরত জুড়ে দিল সার্কাসের দড়াবাজিকরের মত।

ভাল করে দেখার জন্যে শিকের কাছে এগিয়ে গেল কিশোর আর রবিন। খেলতে খেলতে ওদের দিকে কৌতূহল ভরা চোরা চাহনি হানল শিম্পাঞ্জিগুলো।

'ওরা আমার বন্ধু,' গর্বিত ভঙ্গিতে ডক্টর হেমিং বললেন। 'ববি, টপ আর বেবি জুপিটার। আফ্রিকায় জন্ম ওদের। তিন ভাই-বোন। বয়েস কম। মা মারা যাওয়ার পর অনেক কষ্টে নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে। নামগুলো কেমন?'

'ভাল,' জবাব দিল কিশোর।

'আমি রেখেছি।'

'এখানে কিসের গবেষণা করছেন আপনারা?'

'বুদ্ধিমান প্রাণীদের মধ্যে মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি হলো শিম্পাঞ্জি। জিনেটিক গঠনের দিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে নব্বই ভাগ মিল ওদের। আমি শিওর হতে চাচ্ছি, অন্য সব ব্যাপারে কতটা মিল।'

'দেখতে তো অনেকটাই মানুষের মত,' রবিন বলল। কালচে ধূসর রোমশ প্রাণীগুলো আকারে একটা পাঁচ বছরের মানুষের বাচ্চার সমান। ভাব প্রকাশের সময় মুখের ভঙ্গি সব মানুষের মত। এখন যে ভাবে কৌতূহলী চোখে কিশোর আর রবিনকে দেখছে, নতুন কাউকে দেখলে মানুষও এ ভাবেই তাকায়।

'মানুষের সঙ্গে আর কোনদিক থেকে মিল ওদের?' জানতে চাইল কিশোর।

'আমরা দেখেছি, এমন কিছু ক্ষমতা আছে শিম্পাঞ্জিদের যা শুধু মানুষের মাঝেই দেখা যায়,' ডক্টর হেমিং জানালেন। 'যেমন শিম্পাঞ্জিদের আবেগ আছে, কল্পনাশক্তি আছে; ওরা টুলস ব্যবহার করতে পারে; এমনকি কথাও বলতে পারে।'

'কথা বলতে পারে?' রবিন অবাক।

মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর হেমিং, 'পারে। মানুষের মত কণ্ঠ ব্যবহার করে কথা বলতে পারে না, তবে সাইন ল্যাংগুয়েজ জানে। মানুষের মধ্যে যারা বোবা-কালা, কানে শোনে না, তারা যে ভাষায় কথা বলে, তাকে বলে সাইন ল্যাংগুয়েজ।' ডাক দিলেন তিনি, 'টপ!'

লাফ দিয়ে টায়ার থেকে নেমে চার হাত-পায়ে হেঁটে শিকের কাছে এসে দাঁড়াল একটা শিম্পাঞ্জি। দুই হাত আর দশ আঙুলের সাহায্যে দ্রুত কিছু সঙ্কেত দিলেন ডক্টর হেমিং। বড় বড় বাদামী চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল শিম্পাঞ্জিটা।

'আমি ওকে তোমাদের কথা বললাম,' দুই গোয়েন্দাকে জানালেন ডক্টর হেমিং। 'বলাম, তোমরা চিড়িয়াখানার বন্ধু। ওরা বোঝে। চিড়িয়াখানার জন্যে যারা টাকা-পয়সা সাহায্য করে তাদেরকে বন্ধু জানে ওরা। টাকা-পয়সা জিনিসটা কি, ঠিক বোঝে না, তবে এটা বোঝে টাকা জিনিসটা চিড়িয়াখানার জন্যে জরুরী।'

ডক্টর হেমিঙের মত করে টপও হাতের সাহায্যে সঙ্কেত দিল। ওর কালো কালো আঙুলগুলোকে পুরোপুরি মানুষের মত করেই ব্যবহার করল।

'কি বলল?' জানতে চাইল কিশোর।

'ও বলল, চিড়িয়াখানার বন্ধুদের আমার পছন্দ হয়েছে,' দোভাষীর কাজ চালালেন ডক্টর হেমিং।

শিকের ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল টপ। হাতের তালু চিত করা। কিছু চাইছে মনে হলো।

'টাকা চায় না তো?' হেসে উঠল রবিন।

এক পকেট উল্টে দেখাল, টাকা নেই। মানুষের মত কাঁধ ঝাঁকাল টপ। হাতটা সামান্য পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার বাড়িয়ে দিল, হাত মেলানোর ভঙ্গি। হাসিমুখে এগিয়ে গেল রবিন।

'ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে যেয়ো না,' সাবধান করে দিলেন ডক্টর হেমিং।

থমকে দাঁড়াল রবিন, 'কেন?'

'ইচ্ছে করলে ও তোমার হাত ভেঙে দিতে পারে। মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি শিম্পাঞ্জির হাতে। ওদের সঙ্গে খেলাটাও মানুষের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। দেখতে ছোট হলে কি হবে, মানুষকে জখম তো বটেই, মেরেও ফেলতে পারে অনায়াসে।'

আঙুল তুলে কি যেন সঙ্কেত দিল টপ।

'কি বলল?' জানতে চাইল রবিন।

'বলল, টপ মানুষকে জখম করে না,' অনুবাদ করে শোনালেন ডক্টর হেমিং। 'মানুষের ভাষাও বুঝতে শুরু করেছে ওরা। অসম্ভব বুদ্ধিমান। যে কোন জিনিস খুব দ্রুত ধরে ফেলে।...বিশ্বাস করতে পারছ না তো?'

হেলেদুলে আলমারিটার কাছে চলে গেল টপ। লম্বা এক টুকরো কাঠ বের করল। ববি গিয়ে একটা হাতুড়ি আর এক বাক্স পেরেক বের করল। টপ কাঠটা শক্ত করে ধরে রাখল, আর ববি তাতে পেরেক ঠুকতে লাগল। রবিন অবাক। গাছেই বসে রইল বেবি জুপিটার। আনন্দে হাততালি দিতে লাগল।

'শেখালে তো বাড়ি বানিয়ে ফেলবে,' রবিন বলল।

'হয়তো,' হাসলেন ডক্টর হেমিং।

এতই মজা পাচ্ছে কিশোর, সারাদিন এখানে থাকলেও বিন্দুমাত্র বিরক্ত হবে না। কিন্তু এত সময় নেই। যে কাজ করতে এসেছে, সেটা সারা দরকার। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার গবেষণার টাকা কোত্থেকে আসে?'

'চিড়িয়াখানাই দেয়,' হেমিং বললেন। এক টুকরো কালো মেঘ যেন ঢেকে দিল তাঁর মুখ। 'আমাকে তানজানিয়ায় পাঠানোর কথা ছিল, সরেজমিনে গবেষণা করার জন্যে। তানজানিয়া আফ্রিকার দেশ, জানো নিশ্চয়, সারা পৃথিবীতে শিম্পাঞ্জির সংখ্যা ওখানে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু হঠাৎ করেই আমার যাওয়াটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

রবিন লক্ষ করল, কাজ থামিয়ে কথা শুনছে শিম্পাঞ্জিগুলো।

'কে বন্ধ করল?' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, যেন কথার কথা, আগ্রহ নেই তার।

'চিড়িয়াখানার ট্রাস্টি বোর্ড,' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন ডক্টর হেমিং। 'আমার জন্যে বরাদ্দ করা টাকা নিয়ে ওরা চিড়িয়াখানার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকান জঙ্গল সৃষ্টির প্ল্যান করেছে।'

শিম্পাঞ্জিগুলোর দিকে তাকাল রবিন। যতই দেখছে, ততই অবাক হচ্ছে। ডক্টর হেমিঙের মেজাজের পরিবর্তনটাও যেন টের পেয়ে গেছে ওগুলো। তাঁর রাগত কণ্ঠ শুনে ঠোঁট টেনে দাঁত বের করে ওহ্-ওহ্-ওহ্ করছে।

'রেইনফরেস্ট বানানোয় আমার আপত্তি নেই,' হেমিং বললেন। 'কিন্তু আমার টাকা কেড়ে নিয়ে কেন? দুবছর ধরে অপেক্ষা করছি টাকা পাওয়ার জন্যে। যখন পেলাম, ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এখন আবার কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। শুধু কি তাই। আমার একজন সহকারীকেও বিদেয় করে দেয়া হচ্ছে, খরচ কমানোর জন্যে। আফ্রিকায় যাবার টাকা অন্য কোনখান থেকে জোগাড় করতে বলেছে আমাকে। কিন্তু টাকা কি গাছে ধরে, যে চাইলেই পাওয়া যাবে।'

হুড়মুড় করে গিয়ে গাছে উঠে পড়ল টপ আর ববি, বেবি জুপিটারের পাশে। ইহ্-ইহ্-ইহ্ করে তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ছে।

'আমার প্রতি ভীষণ অন্যায় করেছে ওরা,' শিম্পাঞ্জিগুলোর সঙ্গে গলা মিলিয়েই যেন চিৎকার করে উঠলেন ডক্টর হেমিং। 'অথচ রেইনফরেস্ট বানানোর চেয়ে গবেষণাটা অনেক বেশি জরুরী ছিল। মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির সম্পর্ক!...মস্ত বোকামি করেছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।'

গাছের ডালে দোল খেতে খেতে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করল শিম্পাঞ্জিগুলো। বিকট ভঙ্গিতে মুখব্যাদান করে করে দাঁত দেখাতে লাগল। রবিন বুঝতে পারল, এটা ওদের রাগের বহিঃপ্রকাশ।

'কি হলো?' শঙ্কিত দৃষ্টিতে শিম্পাঞ্জিগুলোর দিকে তাকাল কিশোর।

'আমাকে রেগে যেতে দেখলে ওরাও রেগে যায়,' ডক্টর হেমিং বললেন।

ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ। কথা শুনতেই কষ্ট হচ্ছে। দুই হাতে কান চেপে বলে উঠল রবিন, 'উফ্, ভয়ানক শব্দ!'

'অ্যাই, চুপ!' শিম্পাঞ্জিগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন ডক্টর হেমিং।

মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল ওগুলো। এক হাতে গাছের ডালে ঝুলে থেকে তাকিয়ে

রইল ডক্টরের দিকে।

'টিভি দেখলে কেমন হয়?' ওদের জিজ্ঞেস করলেন হেমিং। অনেকটা শান্ত। একটা রিমোট কন্ট্রোল তুলে নিয়ে টেলিভিশনের দিকে তাক করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ডাল ছেড়ে দিয়ে ঝুপঝুপ করে মাটিতে নেমে এল শিম্পাঞ্জিগুলো। টেলিভিশনের সামনে গিয়ে বসল। বাচ্চা ছেলের মত গালে হাত দিয়ে বসল বেবি জুপিটার। পর্দায় ছবি ফুটেছে। তিনটেই তাকিয়ে আছে সেদিকে।

'ওদের প্রিয় সিরিজ,' হেসে বললেন ডক্টর হেমিং, 'ডেজ অভ ডেসটিনি।'

'হাই, ডক্টর হেমিং,' ঘরে ঢুকল সিকিউরিটির ইউনিফর্ম পরা এক যুবক। বয়েস তেইশ-চব্বিশ। লাল চুল ওয়্যার-রিমড চশমা। 'বিকেলের শিফট শুরু হওয়ার আগেই আমার দোস্তদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম। ও, ডেজ অভ ডেসটিনি শুরু হয়ে গেছে।'

'কেমন আছ, ড্যানি?' ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলেন ডক্টর হেমিং।

শিম্পাঞ্জিগুলোকে দেখছে কিশোর আর রবিন। দিন-দুনিয়া ভুলে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে আছে ওগুলো। পর্দার সঙ্গে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যেন চোখ।

'মানুষের সঙ্গে তো এখানেই দেখছি সবচেয়ে বেশি মিল,' হাসতে হাসতে বলল রবিন। 'বেকার বসে টেলিভিশন দেখা, আর পটেটো চীপস খাওয়া।'

মিনিটখানেক পর হেমিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে, টপ, ববি আর বেবি জুপিটারের বিচিত্র জগৎ ছেড়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

'কি বুঝলে?' করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এমনিতে তো খুবই নরম মনের মানুষ বলে মনে হলো,' রবিন বলল। 'তবে রাগও আছে। কর্তৃপক্ষের ওপর রাগ করে জন্তু-জানোয়ার ছেড়ে চিড়িয়াখানার বদনাম করে দিতে চাইলে অবাক হব না। সন্দেহের তালিকায় রাখা যেতে পারে।'

একমত হলো কিশোর। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। পেছনে কারও উপস্থিতি টের পেয়েছে। কেউ যেন আড়িপেতে শুনছে। পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

বিশাল এক গরিলা খাঁচার শিকে কপাল ঠেকিয়ে ওদের দেখছে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল কিশোর। শিম্পাঞ্জিগুলো মানুষের কথা বোঝে; গরিলাও বোঝে না তো? বুঝলে হয়তো সাইন ল্যাংগুয়েজে জানিয়ে দেবে ডক্টর হেমিংকে—দুটো ছেলে তাঁর সমালোচনা করছিল।

'এই বানরের রাজ্য থেকে বেরোনো দরকার,' সহসা অস্থির হয়ে উঠল রবিন।

'হ্যাঁ, চলো,' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'চিড়িয়াখানা বন্ধের সময় হয়ে গেছে।'

# পাঁচ

পরদিন সকাল দশটায় আবার চিড়িয়াখানায় এসে হাজির হলো রবিন ও কিশোর।

প্রথম থামল তুষার চিতার বাড়ির কাছে। প্রিন্সেস চন্দ্রাবতীর সঙ্গে বসে থাকতে

দেখল মুসাকে। রাজকুমারীর পরনে আজ শাড়ি নেই; নীল জিনস আর টি-শার্ট।

'হাই, মুসা,' ডাক দিল কিশোর। এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'ওই যে, এসে গেছে!'

মুখ তুলে তাকাল রাজকুমারী। কাঁদছে।

অবাক হলো রবিন আর কিশোর দুজনেই।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

মুসাকেও বিষণ্ন লাগছে। অস্থির। জানাল, 'সাংঘাতিক কাণ্ড। কান্তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

ভুরু কুঁচকাল রবিন। 'খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানে? কোথায় গেল?'

'ওই যে পাথর দেখছ?' ঘেরের পেছনে গুনাইটের তৈরি কৃত্রিম পাথরগুলো দেখাল মুসা। 'ওখানে একটা দরজা দিয়ে অন্যপাশের খোঁয়াড়ে যাওয়া যায়। চিতাটা রাত কাটায় ওখানে। আজ সকালে কীপার খাবার দিতে গিয়ে দেখে খোঁয়াড় খালি। নিজে নিজে বেরোনো সম্ভব ছিল না চিতাটার পক্ষে। চিড়িয়াখানার কোনখানে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'তারমানে চুরিই হয়ে গেছে,' কিশোর বলল।

'খুঁজে বের করতে হবে ওকে,' চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল চন্দ্রাবতী। 'যে করেই হোক, করতেই হবে।'

'করব,' রাজকুমারীর কাঁধে আলতো চাপড় দিয়ে সান্ত্বনা দিল মুসা। কিশোর আর রবিনের দিকে ফিরে বলল, 'বোম্যানকে অফিসে পাওয়া যাবে। তিনি আরও বিস্তারিত বলতে পারবেন।'

'চলো,' হাঁটতে শুরু করল রবিন।

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও,' কিশোর বলল। 'আমিও আসছি।'

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিল্ডিঙের দিকে চলল দুজনে।

টেলিফোনে কথা বলছেন চিড়িয়াখানার পরিচালক। দুই গোয়েন্দাকে বসতে ইশারা করলেন।

বড় একটা সেগুন কাঠের টেবিলের অন্যপাশে বসে, দেয়ালে চোখ বোলাতে লাগল রবিন। দেয়াল জুড়ে টানানো রয়েছে নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের ছবি। বোঝা যায় সত্যিকারের জন্তু প্রেমিক মিস্টার বোম্যান। ছবিগুলোর সঙ্গে কয়েকটা বিচিত্র জিনিস রয়েছে। আফ্রিকান উপজাতিদের বিভিন্ন ধরনের মুখোশ।

'দেখুন,' ফোনে বলছেন বোম্যান, 'আর কোন তথ্য আমি দিতে পারব না আপনাকে।...কেন পারব না, সেটা তো কোন কথা হলো না। আর কিছু জানা নেই আমার, সেজন্যে পারব না।' রিসিভারটা রেখে দিলেন তিনি। দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পত্রিকা।' শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

'কান্তার কথা শুনে এলাম,' কিশোর বলল। 'কি হয়েছে বলে মনে হয় আপনার?'

বোম্যান জবাব দেয়ার আগেই ঘরে ঢুকল সেই তরুণ সিকিউরিটি অফিসার, আগের দিন যাকে ডক্টর হেমিঙের অফিসে দেখেছিল কিশোর আর রবিন।

'এই যে, রিপোর্ট,' বোম্যানের টেবিলে কয়েক পাতা কাগজ রাখল সে।

'আমার যা যা মাথায় এসেছে, সব লিখে দিয়েছি।'

'কিশোর, রবিন,' পরিচয় করিয়ে দিলেন বোম্যান। 'ও ড্যানি হাওয়ার্ড। আমাদের নাইট সিকিউরিটিম্যান।'

হাত নাড়ল গার্ড। 'কাল তোমাদেরকে ডক্টর হেমিঙের অফিসে দেখেছি না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'অঘটনগুলো কি করে ঘটল,' বোম্যান বললেন, 'জানতে আমাকে সাহায্য করছে ওরা।'

চট করে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। সে আশা করেছিল, ওদের পরিচয় সবার কাছ থেকে গোপন রাখবেন বোম্যান।

'শুনে খুশি হলাম,' হাই ঢাকার জন্যে মুখে হাত চাপা দিল ড্যানি। 'সরি। সতেরো ঘণ্টা ডিউটিতে আছি, শরীর আর চলছে না।'

'ড্যানি, কাল রাতে কি ঘটেছিল এদের বলবে, প্লীজ?' দুই গোয়েন্দাকে দেখালেন বোম্যান।

'নিশ্চয়,' চোখ থেকে চশমা খুলে নিল ড্যানি, কাঁচ পরিষ্কারের জন্যে। 'রাত, এই একটার দিকে, অ্যাভিয়ারির অ্যালার্ম বেজে উঠতে শুনল একজন গার্ড। দৌড়ে গেলাম আমরা কয়েকজন। দেখি, কাঁচের ছাতে কে যেন কতগুলো ফোকর করে রেখেছে। পালিয়ে যাচ্ছে পাখিরা। যত তাড়াতাড়ি পারলাম, বন্ধ করে দিলাম। গার্ড ছিলাম আমরা ছয়জন। সবাই মিলে বেরিয়ে যাওয়া পাখিগুলো ধরার চেষ্টা করতে লাগলাম। রাত দুটোয় আমাদের ডিউটি শেষ। তারপরেও রয়ে গেলাম। যাই হোক, ভাগ্য ভাল বেশির ভাগ পাখি আবার ধরে ফেলতে পেরেছি।'

'আর তুষার চিতার ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইল রবিন।

'আজ সকালে একজন কীপার গিয়েছিল চিতাটাকে খাবার দিতে,' ড্যানি বলল। 'দেখে ওটা নেই। অথচ খোঁয়াড়ে তালা দেয়াই ছিল।'

'তারমানে খাঁচা ভেঙে পালাতে পারেনি,' কিশোর বলল।

'অ্যালার্ম বেজেছিল?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল ড্যানি, 'হয়তো বেজেছিল। কিন্তু পাখি ধরায় এত ব্যস্ত ছিলাম আমরা, শুনতে পাইনি। দশ মিনিট বেজে আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অ্যালার্ম।'

'চিড়িয়াখানার বেড়া এক জায়গায় কাটা ছিল,' বোম্যান জানালেন। 'চোর সম্ভবত ওই পথেই ঢুকেছিল। বেরিয়েছেও ওদিক দিয়েই।'

'সত্যি খুব খারাপ লাগছে, বস্,' লজ্জিত কণ্ঠে ড্যানি বলল। 'আরও সাবধান থাকা উচিত ছিল আমাদের।'

শ্রাগ করলেন বোম্যান। 'চিড়িয়াখানার মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল। বদনামের কথা তো বাদই দিলাম। তবে গার্ডদের দোষ দিতে পারছি না। ওরা পাখি ধরতে ব্যস্ত, এই সুযোগে চিতাটাকে বের করে নিয়ে গেছে। ওদের জানার কথা নয় যে এ রকম কিছু ঘটবে। কাজটা করা হয়েছে ভালমত প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ড্যানি বলল, 'আমি এখন যাই। না শুয়ে আর পারব না।'

বেরিয়ে গেল সে।

বোম্যান বললেন, 'সারা সকাল চিড়িয়াখানায় সূত্র খুঁজে বেড়িয়েছে পুলিশ। কিন্তু কোনই হদিস করতে পারেনি। ভীষণ সতর্ক চোর।'

'কাল রাতের ঘটনাটা মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, 'চিড়িয়াখানায় ঘটে যাওয়া অন্য ঘটনাগুলোর চেয়ে ভিন্ন। আগেরগুলো ছিল স্যাবটাজ, কাল রাতেরটা চুরি। একই লোকের কাজ হতে পারে সবগুলো। আবার আলাদা কারও হতে পারে।'

'হ্যাঁ, তা পারে,' রবিন বলল।

'রিচার্ড, মিনিটখানেক সময় হবে আপনার?' ডেকে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল রবিন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ভাগ্যবান কোটিপতি উইলিয়াম এ· বেরিংটন। আজ পরেছেন অন্য একটা সাফারি শার্ট।

'আরে, উইলিয়াম।' হাত নেড়ে ডাকলেন বোম্যান, 'আসুন, আসুন।'

'কাল রাতে দ্বীপে যাইনি আমি, শহরেই থেকে গিয়েছিলাম,' বেরিংটন জানালেন। 'রেডিওতে শুনলাম খবরটা। শুনেই দৌড়ে এসেছি। ভাবলাম, একবার দেখা করেই যাই।'

'ভাল করেছেন।' গোয়েন্দাদের সঙ্গে বেরিংটনের পরিচয় করিয়ে দিলেন বোম্যান। চিড়িয়াখানার অঘটনগুলো নিয়ে তদন্ত করছে কিশোররা, এ কথা চেপে গেলেন। খুশি হলো কিশোর। যত কম লোকে জানবে, তত ভাল।

তুষার চিতার প্রসঙ্গ উঠল।

'বিপন্ন প্রজাতির মধ্যে পড়ে তুষার চিতা, তাই না?' জানতে চাইল রবিন।

'হ্যাঁ,' বোম্যান বললেন। 'জানামতে পৃথিবীতে এখন চার হাজার তুষার চিতা আছে।'

'আচ্ছা,' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'বিপন্ন প্রজাতি বলতে আসলে কি বোঝায়?'

'বর্তমানে পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ প্রাণী বিলুপ্ত হতে চলেছে,' বেরিংটন বললেন। 'বাঘ, গণ্ডার, গরিলা বিপন্ন প্রজাতির মধ্যে পড়ে। কোন প্রজাতির সংখ্যা অতিরিক্ত কমে গেলে তাদেরকে বিপন্ন প্রাণী ঘোষণা করা হয়। তখন তাদের শিকার করা, তাদের মেরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে ব্যবসা করা বেআইনী। পৃথিবীর অনেক দেশ এক চুক্তিপত্রে সই করেছে, আইনের জোর বাড়ানোর জন্যে।'

'আধুনিক চিড়িয়াখানার মূল উদ্দেশ্য হলো,' বোম্যান জানালেন, 'বিপন্ন প্রাণীকুলকে তুলে এনে প্রজননের সুযোগ দিয়ে তাদের বংশ বৃদ্ধি করা, তাদের রক্ষা করা; সতর্ক দৃষ্টি রাখা, কোনমতেই যেন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে না পারে। এ কারণেই উইলিয়ামের চিতাটাকে নিয়ে প্রজনন করানোর জন্যে এতটা উত্তেজিত হয়ে ছিলাম আমরা।'

'ব্যক্তিগতভাবে বিপন্ন প্রাণী পোষা কি বেআইনী?' বেরিংটনের কাছে জানতে চাইল কিশোর।

'স্পেশাল পারমিট থাকলে পোষা যায়,' বেরিংটন জবাব দিলেন। 'লাইসেন্সধারী একজন জানোয়ার বিক্রেতার কাছ থেকে আমার চিতাটা কিনেছি আমি। কাগজপত্র সব ঠিক আছে আমার। তবে আমি পেলেও খুব কম লোকই এই সুবিধা পেয়ে থাকে।'

'তারমানে, বোঝা যাচ্ছে, কারও পক্ষে একটা বিপন্ন প্রাণী কিনে রাখা খুব কঠিন কাজ,' কিশোর বলল।

'খুব কঠিন,' বোম্যান বললেন।

এ সব প্রশ্নের মাধ্যমে কোন দিকে এগিয়ে চলেছে কিশোর, বুঝতে পারল না রবিন। তবে পরের প্রশ্নটা শুনেই বুঝে ফেলল।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'বিপন্ন প্রাণীদের কি ব্ল্যাক মার্কেট আছে?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকালেন বেরিংটন। 'অনেক ধরনের চোরাই বাজার আছে। কিছু প্রাণী বিক্রি হয় পোষা প্রাণী হিসেবে। কিছু প্রাণীকে মেরে ফেলা হয় চামড়ার জন্যে। কোট বানানো হয়। তুষার চিতার চামড়ায় তৈরি একটা কোটের দাম এখনকার বাজারে কম করে হলেও ষাট হাজার ডলার হবে। কিছু কিছু বিশেষ প্রাণীর জন্যে আলাদা মার্কেট আছে। যেমন অ্যালিগেটরের চামড়ার জন্যে আলাদা মার্কেট, গণ্ডারের শিঙের জন্যে আলাদা, হাতির দাঁতের জন্যে আলাদা। এক মার্কেটে সাধারণত অন্যটা পাওয়া যায় না। চোরা-ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত সতর্ক।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বোম্যান বললেন, 'আরও নানা ভাবে প্রাণী নিয়ে ব্যবসা করে লোকে। টেক্সাসে বড় বড় র‍্যাঞ্চ আছে, শিকার করতে সাহায্য করে ওরা। কায়দা করে বিপন্ন প্রাণীকেও ঠেলে দেয় শিকারীর বন্দুকের সামনে। শিকারীকে শিকার করা প্রাণীর মাথাটা দিয়ে দেয়া হয় ট্রফি হিসেবে।'

'টাকা রোজগারের জন্যে কত ধান্দাই না করে লোকে!' বেরিংটন বললেন আক্ষেপ করে।

'তারমানে,' একবার বেরিংটনের দিকে, আবার বোম্যানের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল কিশোর, 'অনেক কারণেই চুরি করা হতে পারে কান্তাকে। পোষার জন্যে, চামড়ার জন্যে, কিংবা শিকারীকে দুর্লভ প্রাণী শিকারের আনন্দ দেয়ার জন্যে।'

'পোষার জন্যে নিলেও মারা পড়বে চিতাটা,' বোম্যান বললেন। 'বাঁচাতে পারবে না।'

সতর্ক হয়ে উঠলেন বেরিংটন, 'কেন?'

'চিড়িয়াখানায় আনার পর শুরুতে কোনমতেই খাওয়ানো যায়নি ওকে। চন্দ্রাবতীর জন্যে কাতর হয়ে থাকত। তারপর বুদ্ধি করে রাজকুমারীর শাড়ির একটা টুকরো দেয়া হলো তাকে। পরিচিত গন্ধ পাওয়ার পর অস্থিরতা কিছুটা কমল ওর। ভাবল, কাছাকাছিই আছে চন্দ্রাবতী।...সেজন্যেই বলছি, পোষার জন্যে নিয়ে যাওয়া হলেও না খেয়েই মারা যাবে কান্তা।'

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রবিন। খিদেয় কাহিল হয়ে চিতাটা মরে যাওয়ার আগেই ওটাকে খুঁজে বের করার তাগিদ অনুভব করল।

'যাকগে,' নড়েচড়ে উঠলেন বোম্যান। 'পুলিশকে জানানো হয়েছে। যা করার ওরাই করবে।'

আলোচনা এখানেই শেষ, বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা।

# ছয়

বেরিংটন, কিশোর আর রবিন একসঙ্গে বেরোল বোম্যানের অফিস থেকে।

রবিনের মনে পড়ল, বেরিংটন বলেছিলেন, তিনি একটা দ্বীপের মালিক। সেখানে তাঁর একটা ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা আছে। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার চিড়িয়াখানায় কতগুলো জানোয়ার আছে?'

'তিরিশটার মত,' বেরিংটন জানালেন।

'দ্বীপের মালিক, ভাবতেই কেমন লাগে,' কিশোর বলল। 'দ্বীপটা নিশ্চয় খুব সুন্দর?'

'হ্যাঁ,' হাসলেন বেরিংটন। 'আমার দাদার বাবা কিনেছিলেন এটা। মস্ত ধনী ছিলেন। তখন ওটার নাম ছিল পারকার আইল্যান্ড, এখন জু আইল্যান্ড। সাগরের উপকূল থেকে উত্তরে চল্লিশ মাইল দূরে। ওখানে বেশ সুখেই থাকি আমি। নিজের ব্যক্তিগত রাজত্ব।'

কয়েক মিনিট ওদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে এসে 'গুডবাই' জানিয়ে চলে গেলেন বেরিংটন।

'ভাবতে পারো,' রবিন বলল, 'ঘর থেকে বেরোলেই এতগুলো বুনো প্রাণীর সাক্ষাৎ! দ্বীপটা দেখার জন্যে পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি।'

'কিন্তু তোমাকে তো দাওয়াত দিল না,' কিশোর বলল।

মুসা আর চন্দ্রাবতীকে আসতে দেখা গেল। অনেকটা শান্ত এখন রাজকুমারী। বড় বড় কালো চোখে বিষণ্ণতা।

'নতুন কিছু জানা গেল?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'নাহ্,' রবিন বলল।

আরও বিষণ্ন হয়ে গেল চন্দ্রাবতী। সে আশা করেছিল, কান্তার খবর পাবে। বলল, 'মুসা আমাকে বলেছে, কান্তাকে তোমরা খুঁজে বের করবেই।'

'আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা আমরা করব,' জবাব দিল কিশোর।

চোখ তুলে দূরের মনোরেলটার দিকে তাকাল সে। হঠাৎ চোখে পড়ল, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেই রহস্যময় ছেলেটা। আজও মনে হলো চন্দ্রাবতীর দিকেই নজর।

'চন্দ্রাবতী,' নিচু স্বরে বলল কিশোর, 'তোমার পেছনে একটা ছেলে। দেখো তো, চেনো নাকি?'

বুদ্ধি আছে রাজকুমারীর। সরাসরি তাকাল না। নিচু হলো জুতোর ফিতে বাঁধার ছুতো করে। মুখ তোলার সময় দেখে নিল ছেলেটাকে। বিস্মিত শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

'কে ছেলেটা?' জানতে চাইল রবিন।

'চলো, এখান থেকে সরে যাই,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল চন্দ্রাবতী। আর

দাঁড়াল না, হাঁটতে শুরু করল।

পিছু নিল অবাক তিন গোয়েন্দা।

'কি ব্যাপার?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এখনও শিওর না।'

ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল, পেছন পেছন আসছে ছেলেটা।

ঘের দেয়া একটা তৃণভূমির পাশ দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। ভেতরে আমেরিকার ওল্ড ওয়েস্টের দৃশ্য। বিরাট একটা বাইসন খেতে খেতে মুখ তুলে তাকাল ওদের দিকে।

ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, ছেলেটা এখনও আসছে ওদের পিছে পিছে। 'অনুসরণ করছে, কোন সন্দেহ নেই আর এখন।' এদিক ওদিক তাকাল। 'ওকে ফাঁকি দেয়ার ব্যবস্থা কি?'

'এসো আমার সঙ্গে,' বলে আগে আগে হাঁটতে লাগল মুসা।

কালো একটা বিল্ডিঙের সামনে চলে এল ওরা। বাড়িটার চূড়ায় একটা নকল চাঁদ বসানো। দরজার দিকে এগোল মুসা। 'এসো, ঢুকে পড়ি। ওকে লেজ থেকে খসাতে আর অসুবিধে হবে না।'

রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়ল তিনজনে। দিনের বেলাতেও এখানে ঘন অন্ধকার। রাতের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। পথ দেখানোর জন্যে রয়েছে খুদে খুদে কিছু লাল আলো।

'এটার নাম নাইট ওয়ার্ল্ড,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'নিশাচর প্রাণী রাখে এখানে। দিনের বেলা যারা ঘুমায়, রাতে জেগে ওঠে।'

'দারুণ বানিয়েছে যাই বলো,' প্রশংসা না করে পারল না রবিন। লাল আলোয় লেখা সাইনবোর্ড দেখা গেল। কোন্ জায়গায় কোন্ জানোয়ার আছে বোঝানোর জন্যে। 'দেখে আসি,' বলে পা বাড়াল সে।

'আউক!' করে উঠল কিশোর। 'দিলে তো আমার পা মাড়িয়ে!'

'সরি, দেখতে পাইনি! অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসেনি এখনও।'

কয়েক মিনিট পর আঁকাবাঁকা একটা করিডর ধরে এগোল দলটা। ওরা বাদে আরও দর্শক আছে। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে ওরা, যেন ঘুমন্ত জানোয়ারগুলোর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ার ভয়ে।

একটু পর পরই পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে কিশোর, ছেলেটা আসছে কিনা দেখার জন্যে। ও কে, জানা দরকার। চন্দ্রাবতী বলতে পারবে। কিন্তু তাকে প্রশ্ন করার সময় এখন নয়। জিজ্ঞেস করলে বলবে কিনা, সেটাও প্রশ্ন। বোঝা যাচ্ছে, ছেলেটার পরিচয় গোপন রাখতে চাইছে সে।

বড় একটা আয়তাকার কাঁচের ওপাশে, মৃদু ভুতুড়ে আলোয় তৈরি করা হয়েছে জঙ্গলের পরিবেশ। কৃত্রিম ডোবার পাড়ে ছোট একটা অ্যালিগেটরের মূর্তি ফেলে রাখা হয়েছে। ওপরে পাকানো দড়ির মত দেখতে গাছের ডাল থেকে মাথা নিচু করে নিথর ঝুলে আছে কয়েকটা রোমশ প্রাণী।

'কি ওগুলো?' জানতে চাইল চন্দ্রাবতী। 'ইঁদুর নাকি?'

'না, বাদুড়,' জবাব দিল মুসা।

যেন নিজেদের সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে বুঝতে পেরেই জ্যান্ত হয়ে উঠল একটা বাদুড়। ডাল আঁকড়ে ধরা নখগুলো খুলে নিয়ে ছেড়ে দিল নিজেকে। পতন শুরু হতেই নিখুঁত ভঙ্গিতে ছাতার কাপড়ের মত ডানা মেলে ভেসে পড়ল শূন্যে। দেখাদেখি বাকি বাদুড়গুলোও জেগে গেল। ডানা ঝাপটে, ডিগবাজি খেয়ে, খেপার মত উড়ে বেড়াতে লাগল কাঁচের দেয়াল ঘেরা বদ্ধ আকাশে।

'বাপরে! কি সাংঘাতিক!' কেঁপে উঠল চন্দ্রাবতী। দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না।

'ফ্রুটব্যাট,' মুসা বলল। 'ফল খায়।'

'শুধু ফল না,' রবিন বলল, 'পোকামাকড়ও খায়। নামে ফ্রুটব্যাট।'

ফিরে তাকাল আবার কিশোর। রহস্যময় ছেলেটাকে দেখতে পেল না। খসানো গেছে মনে হচ্ছে।

বাদুড় দেখা শেষ হলে মুসা বলল, 'এসো, আরেকটা জিনিস দেখাই।'

দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে আরেকটা জানালার কাছে নিয়ে এল মুসা। ওটার ভেতরেও বাদুড় উড়ছে। তবে আগেরগুলোর চেয়ে আলাদা।

'অ,' বলে উঠল রবিন, 'ভ্যাম্পায়ার ব্যাট!'

রক্তচোষা এই বাদুড়ের সঙ্গে ভালমত পরিচয় আছে ওদের। আমাজানের জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার ধরতে গিয়ে এই বাদুড়ও ধরে এনেছিল। যে কোন বাদুড়-বিশেষজ্ঞের চেয়ে এদের স্বভাব কম জানে না ওরা।

'ভয় লাগছে, রাজকুমারী?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

জবাব নেই।

'রাজকুমারী!' গলা চড়াল মুসা।

ফিরে তাকাল কিশোর। রাজকুমারী নেই। গেল কোথায়? এক মুহূর্ত আগেও তো ছিল।

রাজকুমারী কোথায় দেখার জন্যে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কানে এল মহিলাকণ্ঠের চিৎকার।

একটা সেকেন্ডের জন্যে যেন পুরোপুরি নিথর হয়ে গেল নাইট ওয়ার্ল্ড।

পরক্ষণে শুরু হলো গুঞ্জন। দর্শকরা সব কৌতূহলী হয়ে দেখতে চাইছে কে চিৎকার করেছে।

কিশোর বোঝার চেষ্টা করছে, কোনদিক থেকে এল চিৎকারটা। রবিন তার হাত আঁকড়ে ধরল। 'রাজকুমারীর চিৎকার না? দেখা দরকার।'

'নিশ্চয় সেই রহস্যময় ছেলেটা,' কিশোর বলল।

মরিয়া হয়ে চারপাশে তাকিয়ে রাজকুমারীকে দেখার চেষ্টা করছে মুসা। নাম ধরে ডেকে উঠল, 'চন্দ্রাবতী! চন্দ্রাবতী!'

'বেশি দূরে যেতে পারেনি এখনও,' কিশোর বলল। 'ছড়িয়ে পড়ো। আমি এদিকে যাচ্ছি।'

তিনজন তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ল ওরা। নাইট ওয়ার্ল্ডের অন্ধকার করিডর ধরে ছুটল আন্দাজে। মিনিটখানেক পর পরই রাজকুমারীর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে

লাগল। জবাব পেল না।

কিশোরের মনে হলো, দূরের কোণে আবছামত দেখা যাচ্ছে কাকে।

'কে ওখানে!' বলেই ছুটল সেদিকে। 'চন্দ্রাবতী? তুমি?'

'না, আমি,' জবাব দিল একটা ভোঁতা, বয়স্ক কণ্ঠ। সেলুলার ফোনে কথা বলছে একজন বুড়ো ভদ্রলোক।

'সরি,' বলে করিডর ধরে এগিয়ে গেল কিশোর। কয়েকটা ডিসপ্লে কেস পার হয়ে এসে বাইরে বেরিয়ে এল। উজ্জ্বল আলোয় অন্ধ হয়ে গেল যেন। কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে রেখে, বার কয়েক মিটমিট করে চোখে সইয়ে নিল দিনের আলো। সামনে তাকাতেই দেখতে পেল রাজকুমারীকে। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলছে সেই রহস্যময় ছেলেটার সঙ্গে। বোঝা যাচ্ছে, তর্ক করছে।

দৌড় দিল কিশোর। ওকে দেখে কথা বন্ধ হয়ে গেল দুজনের। ঝটকা দিয়ে আরেক দিকে মুখ ঘোরাল ছেলেটা, যেন রাগ দমনের চেষ্টা করছে।

'ঠিক আছ তো তুমি?' রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'চিৎকার শুনলাম...'

'আমি ভালই আছি,' অস্বস্তির ভঙ্গিতে চুলের মধ্যে তার আঙুল চালানো দেখেই বোঝা গেল, সত্যি বলছে না চন্দ্রাবতী।

রবিন আর মুসাও বেরিয়ে, দৌড়ে এল ওদের দিকে।

'কি ব্যাপার?' এসেই প্রশ্ন শুরু করল মুসা। 'এই লোকটা কে? কি হচ্ছে?'

গাঢ় বাদামী চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে মুসাকে দেখতে লাগল ছেলেটা। রাজকুমারীকে বলল, 'আপাতত তোমার নতুন বন্ধুদের কাছে ফেলে যাচ্ছি। কিন্তু, ইয়োর হাইনেস, আমি হাল ছাড়ব না, বলে রাখলাম।'

দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলো বলে, একবারও পেছনে না তাকিয়ে, গটমট করে হেঁটে চলে গেল রহস্যময় ছেলেটা।

'ও কে, চন্দ্রাবতী?' জানতে চাইল রবিন।

'আমার দেশের লোক,' কর্কশ কণ্ঠে বলল রাজকুমারী। 'আমার মতই আমেরিকায় পড়তে এসেছে।'

ভুরু কুঁচকে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি চায় ও?'

'তেমন কিছু না,' দুই হাতে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরাল চন্দ্রাবতী। 'অন্ধকারে চুপি চুপি আমার পেছনে এসে চমকে দিয়েছিল, তাই চিৎকার করে উঠেছিলাম। হাত ধরে তখন টেনে আমাকে বাইরে নিয়ে এল ও। তোমাদের বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'যদি তেমন কিছু না-ই হয়, ওর কাছ থেকে সরে যাওয়ার জন্যে এত অস্থির হয়ে উঠেছিলে কেন?'

কিশোরের দিকে তাকিয়েই আবার চোখ সরিয়ে নিল চন্দ্রাবতী। 'আসলে...কি বলব...ছেলেমানুষিই করে ফেলেছি।... তেমন সাংঘাতিক কিছু না...'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রসঙ্গটা বাদ দিতে হলো কিশোরকে। বুঝতে পারছে, ভেতরে আরও ব্যাপার আছে। কিন্তু রাজকুমারী যদি মুখ না খোলে, কি আর করা।

'চলো, আমাদের কাজে আমরা যাই,' রবিনকে বলল কিশোর। 'প্রথমে ওই জন্তু-প্রেমিক ওয়ালথ্রপদের ওখানে যাব। গতকাল যে পুস্তিকা দিয়েছিল আমাদের, তার মধ্যেই আছে ঠিকানা।'

'ভাল বুদ্ধি,' একমত হলো রবিন।

মুসাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিশোর বলল, 'দেখো, ওর কাছ থেকে ছেলেটা সম্পর্কে কোন কথা আদায় করতে পারো কিনা। ছেলেটা কি চায়, জানতে হবে। এ কেসের জন্যে জানাটা জরুরী হতে পারে।'

'দেখি চেষ্টা করে,' মুসা বলল।

মাথার ওপর দিয়ে কয়েকটা পাখি উড়ে যেতে শুনে ওপরে তাকাল রবিন। আকাশের ইতিউতি ছড়িয়ে পড়েছে কয়েক টুকরো ধূসর রঙের মেঘ। 'বৃষ্টি আসবে।' মুখ নামিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল, 'ভিজতে না চাইলে, জলদি চলো এখান থেকে পালাই।'

# সাত

ঘণ্টাখানেক বাদে শহরতলির একটা গলির মধ্যে গাড়ি ঢোকাল রবিন।

'সস্তা এলাকা,' বলল সে।

জীর্ণ, বিবর্ণ বাড়িগুলোর দিকে তাকাল কিশোর। সরু রাস্তাটারও জায়গায় জায়গায় ছাল উঠে গেছে, ছোট ছোট গর্ত। 'হুঁ। ওয়ালথ্রপদের টাকা নেই।'

গাড়ি থেকে নেমে কোণের একটা মলিন চেহারার রঙচটা বাড়ির দিকে এগোল দুজনে। সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। খাড়া একটা সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠে একটা দরজার গায়ে ওয়ালথ্রপদের নম্বর দেখতে পেল। ভেতরে রেডিওতে জোরাল শব্দে বাজছে রক মিউজিক।

দরজায় টোকা দিল কিশোর।

খুলে দিল রায়না ওয়ালথ্রপ।

'তুমি!' বিস্মিত হয়েছে সে। কিশোরকে দেখে খুশি নয়, বোঝা গেল। 'কি চাও?'

'আপনাদের পুস্তিকাটা পড়লাম,' চিৎকার করে বলতে হলো কিশোরকে, বাজনার প্রচণ্ড শব্দ কান ঝালাপালা করছে। 'আমরাও ইনটারেস্টেড···আপনাদের প্রতিষ্ঠানের যদি ভলান্টিয়ার হতে চাই, আপত্তি আছে?'

দ্বিধা করল রায়না। দরজা থেকে সরে গিয়ে বলল, 'এসো।'

এ.আর.এফ. হেডকোয়ার্টারে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। একটা মাত্র ঘর। দুটো ডেস্ক, একটা ফাইলিং কেবিনেট আছে। সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে কাগজ।

একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে নিক। হাত নাড়ল ওদের দিকে।

'আমরা কাজে নামার আগে,' চিৎকার করে বলল কিশোর, 'অ্যানিমেল রাইটস ফোর্সের ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য জানতে পারলে ভাল হত।'

রেডিও বন্ধ করে দিল রায়না।

'বসো,' দুটো ধাতব চেয়ার দেখাল নিক।

বসল কিশোর আর রবিন।

জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে নিক। রায়না দাঁড়িয়ে আছে ঘাড়ের ওপর। অস্বস্তি কাটাতে পারছে না। আদালতের কাঠগড়ায় জেরার মুখোমুখি হয়েছে মনে হলো রবিনের।

'পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী কি জানো?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল নিক।

'সিংহ,' জবাব দিল রবিন।

মাথা নেড়ে কিশোর বলল, 'সিংহ না। আমাদের কথা বলছে।'

'ঠিক বলেছ,' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল নিক। 'আমরা। মানুষ। হোমো স্যাপিয়েন্স। মানুষ হলো সবচেয়ে বিপজ্জনক জীব।'

'পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে,' নিকের সঙ্গে সুর মেলাল রায়না। 'কেন জানো? পৃথিবী জুড়ে গাছপালা, বন-বাদাড় সব নষ্ট করে দিয়েছে মানুষ; অসহায় এ সব প্রাণীদের থাকার জায়গা শেষ করে দিয়েছে। সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিসপত্র সাফ করে ফেলছে, জোর করে বেশি বেশি শস্য ফলাতে বাধ্য করছে মাটিকে। যে সব প্রাণী এখনও টিকে আছে, ওগুলোকে মেরে শেষ করছে ওদের চামড়ার জন্যে; হাড়, শিং, দাঁতের জন্যে।'

'শুধু তাই নয়,' রায়নার কথা লুফে নিল নিক। 'ওদের মহা যন্ত্রণার কারণ হয়েছি আমরা। কাউকে ধরে খাচ্ছি, কাউকে জোর করে ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজে লাগাচ্ছি; নিজেদের বিনোদনের জন্যে ধরে এনে সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছি।'

'আর চিড়িয়াখানার কথা ভুললেও চলবে না,' রায়না বলল।

'কিন্তু,' প্রতিবাদ করল কিশোর, 'অন্য সব কিছুর সঙ্গে চিড়িয়াখানার তুলনা করাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। এখানে জন্তু-জানোয়ারের যত্ন করা হয়, খাবার দেয়া হয়, চিকিৎসা করা হয়—বনে যে সব ব্যবস্থা নেই। রকি বীচ চিড়িয়াখানার সমস্ত জানোয়ারকে আমার তো বেশ স্বাস্থ্যবানই মনে হয়েছে।'

'তা ছাড়া বিলুপ্ত হয়ে আসা প্রাণীদের শেষ আশ্রয় হলো চিড়িয়াখানা,' রবিন বলল। 'ওদের প্রজনন করিয়ে, বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে চিড়িয়াখানাগুলো।'

'প্রকৃতি কোন প্রাণীকেই খাঁচায় আটকে ফেলে চিকিৎসা করতে বলেনি,' ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল রায়না। হাতের কাছে টেবিলটাতে চাপড় মারল। 'ওদেরকে ওদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দিয়ে আসা উচিত। নিজেদের খাবার ব্যবস্থা, নিজেদের চিকিৎসা ওরা নিজেরাই করে নিতে পারবে। এটা ওদের যুগ-যুগান্তরের প্র্যাকটিস, জন্মগত অধিকার।'

'কৃত্রিম আইন তৈরি করে বাহবা নিচ্ছে মানুষ,' নিক বলল। 'একটিবারও ভাবে না, তার চেয়ে অনেক বড় আইন আছে স্রষ্টার, প্রকৃতির আইন।'

ভেবেচিন্তে পরের কথাটা বলল কিশোর, 'প্রকৃতির আইনকে প্রাধান্য দেবার জন্যে মানুষের আইন ভাঙছেন নাকি আপনারা?'

পরস্পরের দিকে তাকাল স্বামী-স্ত্রী।

'না,' জবাব দিল রায়না, 'ভাঙিনি। তবে ওই আইনের প্রতি কোন আস্থা নেই আমাদের।'

'আইন ভাঙা শুরু করলে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরে দেবে,' একটা খাম তুলে নিল নিক। 'ওদের সঙ্গে পারব না। জেলে আটকে থাকলে জন্তু-জানোয়ারের পক্ষ নিয়েও কথা বলা আর হবে না। তার চেয়ে সব কিছু সহ্য করেও মুক্ত থাকাই ভাল।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওয়ালথ্রপ দম্পতির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'আসলে আপনাদের উদ্দেশ্যটা কি, কি করতে চাইছেন?'

'যতটা সম্ভব, প্রতিবাদ চালিয়ে যাব,' রায়না বলল। দুই হাত আড়াআড়ি রাখল বুকের ওপর। 'প্রচুর চিঠিপত্র লেখালেখি করছি আমরা, টেলিফোন করছি, সচেতন করার চেষ্টা করছি মানুষকে।'

'ও,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আমাদেরকে ভলান্টিয়ার বানালে আপনাদের কি কোন সুবিধে হবে?'

'এখনও বলতে পারছি না।' কিশোরকে দুটো বই দিল নিক। 'এগুলো ধার দিলাম, পড়ে দেখো। জন্তু-জানোয়ারের ওপর কি পরিমাণ অত্যাচার করে মানুষ, লেখা আছে। পড়ার পরও যদি আগ্রহ থাকে, ফোন কোরো আমাদের।'

রবিন কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে রায়না বলল, 'আমাদের যাওয়া দরকার, নিক।' ফাইলিং কেবিনেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটা ড্রয়ার খুলে হাত ঢোকাল ভেতরে।

কিছু বলার জন্যে নিকের দিকে ফিরল রবিন।

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল নিক। 'আমাদের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। চলো, তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আসি।'

অফিসে তালা লাগাল নিক। রাস্তা পর্যন্ত দুই গোয়েন্দাকে এগিয়ে দিল সে আর তার স্ত্রী। গুড-বাই জানাল। তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল ব্লকের শেষ মাথায় পার্ক করা জরাজীর্ণ একটা সবুজ রঙের শেভ্রলে গাড়ির দিকে।

'পিছু নেব নাকি?' গাড়িতে উঠে রবিন বলল।

'নাহ্, এখন দরকার নেই,' কিশোর বলল। 'গাড়িটা তো চিনেই রাখলাম। পরে দেখা যাবে।'

'ওদের আইন অমান্য না করার কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না। আরেকবার গিয়ে ঢুঁ মেরে এলে কেমন হয়? ওদের অবর্তমানে?'

'ঠিক এই কথাটাই ভাবছি আমি,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল কিশোর। তাকিয়ে রইল শেভ্রলেটার দিকে।

গাড়িটা না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা। তারপর নেমে গিয়ে পেছনের বুট খুলে কয়েকটা যন্ত্রপাতি বের করল রবিন। রওনা হলো দুজনে। আবার উঠে এল চারতলায়, ওয়ালথ্রপদের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তালা খুলে ঢুকে পড়ল অফিসে।

ফাইলিং কেবিনেটে খুঁজতে আরম্ভ করল রবিন। ফোনটা পরীক্ষা করতে লাগল কিশোর। দ্রুত বের করে ফেলল ফোনের এনট্রি কোড। প্রয়োজনে ট্যাপ করে

ফেলে গোপনে কথাবার্তা শুনতে পারবে। তারপর ডেস্কে রাখা কাগজপত্র ঘাঁটা শুরু করল। কৌতূহল জাগানোর মত একটা জিনিসই পেল, একটা মেমো। লেখা রয়েছে: প্যাসিফিক এক্সপোর্টার, সকাল সাড়ে দশটা, আগস্ট ৭। একটা কাগজে লিখে নিল কথাগুলো।

খবরের কাগজ থেকে কেটে রাখা সংবাদের একটা ফাইল বের করল রবিন। প্রতিটি খবরই জন্তু-জানোয়ারের ওপর লেখা: ল্যাবরেটরিতে গবেষণা, চিড়িয়াখানা, শিকার, চোরাশিকার এ সবের ওপর। দেখতে দেখতে অবশেষে একটা খবরের ওপর এসে চোখ আটকে গেল রবিনের। হেডলাইন করা হয়েছে: গবেষণাগারের জানোয়ার ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে দম্পতিকে সন্দেহ। দ্রুত লেখাটা পড়ে ফেলল সে। শিস দিয়ে উঠল। 'কিশোর, শোনো। বছরখানেক আগে মিসৌরির সেইন্ট লুইয়ের এক গবেষণাগার থেকে মেডিক্যাল রিসার্চের জন্যে এনে রাখা কিছু শিম্পাঞ্জি, ইঁদুর আর সাপ চুরি হয়ে যায়। কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তবে ওয়ালথ্রপ দম্পতিকে সন্দেহ করে। কর্তৃপক্ষও কোন কারণে—তাদের গবেষণাগারের বদনাম হওয়ার ভয়েই হয়তো, চেপে যায়, গ্রেপ্তার করানোর জন্যে চাপাচাপি করেনি।'

'দেখি তো,' লেখাটা পড়ার জন্যে এগিয়ে এল কিশোর। পড়ার পর বলল, 'ওয়ালথ্রপদের তো অপরাধী প্রমাণ করতে পারেনি।'

'তবুও...'

'রবিন, নোড়ো না!' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'কেন?' অবাক হয়ে ফাইল থেকে মুখ তুলল রবিন।

পেয়ে গেল জবাবটা। ফাইলিং কেবিনেটের ওপরে তার কব্জির কাছ থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে একটা তিন ফুট লম্বা সাপ। সাপটার চামড়া নীল আর সবুজ রঙের, কালো কালো ডোরা।

ঢোক গিলল রবিন। 'ওয়ালথ্রপদের প্রহরী নাকি?'

'মনে হয়,' এক দৃষ্টিতে সাপটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'বিষাক্ত প্রহরী।'

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে আরম্ভ করেছে রবিনের। কত দ্রুত ছোবল মারতে পারে সাপ, জানা আছে ওর। পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে থেকে নিচু স্বরে বলল, 'সেজন্যেই বোধহয় বেরোনোর আগে কেবিনেট খুলেছিল রায়না। ড্রয়ার ফাঁক করে রেখেছিল, যাতে সময়মত বেরিয়ে আসতে পারে প্রহরীটা।'

'হ্যাঁ।...নোড়ো না।'

পাগলের মত দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে রবিনের। জোর করে দমন করল ইচ্ছেটা। দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

ঘরের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগল কিশোরের চোখ।

রবিনের চোখ সাপটার ওপর স্থির।

হঠাৎ, তীব্র গতিতে রবিনের হাত লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল সাপটা।

দাঁত ফোটার তীক্ষ্ণ ব্যথার জন্যে অপেক্ষা করছিল রবিন। কিন্তু ফুটল না। খসখসে আঁশওয়ালা শীতল একটা শরীর পেঁচিয়ে যেতে শুরু করল তার হাতে।

# আট

তাকিয়ে আছে কিশোর। দুচোখে আতঙ্ক।

'একদম চুপ!' রবিনকে সাবধান করল সে। 'যা করার আমি করছি!'

রবিনের হাত বেয়ে উঠতে শুরু করল সাপটা।

শান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে রবিন। তাকিয়ে আছে সাপটার দিকে। লম্বা জিভটা বাতাসে কিলবিল করে নেচে উঠে আবার ভেতরে চলে গেল। কেঁপে উঠল রবিন।

'জলদি, কিশোর!' ভয়ে কথা বেরোতে চাইছে না মুখ দিয়ে।

'আসছি। তুমি নড়াচড়া কোরো না,' একটা তারের হ্যাঙ্গারকে টেনে সোজা করে সেটা নিয়ে ফিরে এল কিশোর। সাবধানে, খুব ধীরে ধীরে আঁকশির মত বাঁকা করে রাখা তারের মাথাটা সাপটার দিকে বাড়িয়ে দিল। থেমে গেল সাপটা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল।

'কি করছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চুপ করে থাকো।'

আবার হাত বেয়ে উঠতে শুরু করল সাপটা। দম আটকে রাখল রবিন। সাপটার ফাঁক করে রাখা মুখটা দেখতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে ভেতরের বিষদাঁত দুটো।

আচমকা বিদ্যুৎ খেলে যেন কিশোরের হাতে। আঁকশিটা ধেয়ে এল রবিনের বাহু লক্ষ্য করে। সাপের পেট ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল রবিনের হাত থেকে। ছুঁড়ে দিল শূন্যে।

'সরো! ভাগো!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

দ্বিতীয়বার আর বলতে হলো না রবিনকে। হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। পেছনে দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রবিনের মুখ। ওয়ালথ্রপদের দরজার বাইরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কাঁপুনি থামানোর জন্যে।

'আমি তো ভেবেছিলাম, ওয়ালথ্রপরা বনের জানোয়ার কখনও ঘরে ঢোকাবে না,' দুর্বল কণ্ঠে বলল সে।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'আমার তো এখন মনে হচ্ছে, সব আইন ভাঙার ব্যাপারে ওস্তাদ ওরা—মানুষেরই হোক, আর খোদারই হোক।'

'চলো, সময় থাকতে কেটে পড়ি এখান থেকে,' ভয়ে ভয়ে দরজার নিচের ফাঁকটার দিকে তাকাল সে। সাপটা বেরোনোর জন্যে যথেষ্ট ফাঁক।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল দুজনে।

কয়েক মিনিট পর গাড়ি চালাতে চালাতে একটা ফাস্ট-ফুডের দোকান দেখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। সেলুলার ফোনে কথা বলছে কিশোর। নিকের

টেবিলে যে মেমোটা দেখেছে, সেটার ব্যাপারে।

কথা শেষ করে সুইচ অফ করে দিয়ে রবিনের দিকে তাকাল, 'প্যাসিফিক এক্সপোর্ট একটা খুদে কার্গো এয়ারলাইন, রকি বীচ এয়ারপোর্টে নতুন অফিস খুলেছে ওরা। বিচিত্র মাল বহন করে। হিমায়িত জিনিস থেকে জীবন্ত প্রাণী, সব।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'ভেরি ইনটারেস্টিং।'

গাড়ি থেকে নেমে গেল সে। কয়েকটা বার্গার আর কিছু ফিঙ্গার চিপস কিনে নিয়ে ফিরে এল।

'ওয়ালথ্রপদের বক্তব্য,' একটা বার্গারে কামড় বসাল কিশোর, 'তারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। ভাল কথা। অন্য কার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে, জানি না, তবে আমাদের যে পেরেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আইন অমান্য করে না, এ কথা আর বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'তারমানে চিড়িয়াখানা থেকে জন্তু-জানোয়ার পালাতে সাহায্য করেছে ওরাই,' একটা কোকের ক্যান কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল রবিন। 'কিন্তু তুষার চিতাটাকে গায়েব করে দিল কেন ওরা?'

'খবরের কাগজের নজর কাড়ার জন্যে, হয়তো। যতটা আশা করেছিল, তারচেয়ে বেশি সাড়া পড়ে যাবে ভেবেছে। ভেবে থাকলে, ভুল করেনি। মিস্টার বেরিংটন বললেন না, রেডিওতে খবর পেয়ে তিনি এসেছেন। তারমানে অতদূর চলে গেছে খবর। টিভিওলারাও বলতে থাকবে। পত্রিকাগুলো তো বলবেই। বিপন্ন প্রজাতির একটা প্রাণীকে রক্ষা করতে পারেনি রটে গেলে চিড়িয়াখানাটার অতিরিক্ত বদনাম হবে। ওয়ালথ্রপদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার।'

'তারমানে, ধরে নেয়া যায়,' বার্গারের মোড়ক খুলতে খুলতে রবিন বলল, 'তুষার চিতাটাকে ওরাই কিডন্যাপ করেছে। প্যাসিফিক এক্সপোর্টারের মাধ্যমে সেটাকে পাচারের ব্যবস্থা করেছে।'

'কাল সকাল দশটায় প্যাসিফিকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে ওরা। ওই সময়ের মধ্যে কান্তাকে পাওয়া না গেলে অবশ্যই ঢুঁ মারব কাল ওখানে। আর, আজ রাতে পাহারা দিতে যাব চিড়িয়াখানায়।'

'আমার তাতে কোনই আপত্তি নেই।'

বার্গারে কামড় বসাল রবিন।

চিড়িয়াখানায় যখন পৌঁছল ওরা, সেদিনকার মত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চিড়িয়াখানা। বৃষ্টি হয়নি যদিও, ধূসর মেঘগুলো যেন আকাশ ছেড়ে যেতে নারাজ। সোজা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের দিকে হাঁটা দিল দুজনে।

অফিসেই পাওয়া গেল বোম্যানকে। ফাইল দেখছেন। 'পুলিশ কোন সন্ধানই করতে পারেনি এখনও,' জানালেন তিনি। 'আর তোমার বন্ধু মুসা জানিয়ে গেছে, তোমাদের বলার জন্যে, রাজকুমারীর পিছু নেয়া রহস্যময় ছেলেটার ব্যাপারে কিছু জানতে পারেনি সে।...তোমরা কিছু করতে পারলে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'তেমন কিছু না। তবে স্যাবটাজের ঘটনাগুলো যেহেতু রাতে ঘটে, আজ রাতে চিড়িয়াখানায় পাহারা দিতে চাই। হয়তো কিছু বের করে

ফেলতে পারব।'

'এতে,' রবিন বলল, 'নাইট গার্ড যারা পাহারায় থাকে, তাদের সঙ্গেও পরিচিত হওয়া যাবে। ওদের ব্যাপারে খোঁজ-খবরও নেয়া দরকার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে ওয়াকি-টকি তুলে নিলেন পরিচালক। 'ড্যানি, বোম্যান বলছি। আমার অফিসে একটু আসবে, প্লীজ?'

পাঁচ মিনিট পর অফিসে ঢুকল ড্যানি হাওয়ার্ড। পরনে সিকিউরিটির ইউনিফর্ম। সকালের চেয়ে তাজা লাগছে।

'ড্যানি,' বোম্যান বললেন, 'কিশোর আর রবিন আজকের রাতটা সিকিউরিটিদের সঙ্গে কাটাতে চায়। তুমি ওদের সাহায্য করবে?'

'নিশ্চয় করব,' আন্তরিক উজ্জ্বল হাসি গোয়েন্দাদের উপহার দিল ড্যানি। 'এসো।'

বাইরে দাঁড় করানো একটা গাড়িতে এনে তুলল ওদের।

'রাতের বেলা দুই শিফটে কাজ করে সিকিউরিটিরা,' গিয়ার দিতে দিতে জানাল ড্যানি। 'প্রথমটা চলে ছ'টা থেকে দুটো পর্যন্ত; দ্বিতীয়টা দুটো থেকে সকাল দশটা। প্রতি শিফটে ছয়জন করে গার্ড থাকে।'

'বাপরে,' মাথা নাড়তে নাড়তে রবিন বলল, 'সারারাত ধরে রোজ রোজ ওরকম ডিউটি দেয়ার কথা ভাবতেই পারি না আমি।'

'মাঝে মাঝে অবশ্য খারাপ লাগে,' স্বীকার করল ড্যানি।

ক্যাট কম্পাউন্ডে ঢুকে একটা বেড়া দেয়া জায়গার পাশে জীপ রাখল সে। কোমরে ঝোলানো বড় চাবির রিঙ থেকে চাবি খুলে নিয়ে গেটের তালা খুলল। দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে এল একটা ছোট্ট ঘরের কাছে।

'এই এলাকায় শুধু স্টাফরা ঢোকে,' সাবধান করে দিল ড্যানি। 'এখানে ঘোরাফেরা করা বিপজ্জনক...'

তার কথা শেষ হলো না, ভয়ঙ্কর এক গর্জন প্রতিধ্বনি তুলল বাড়ির দেয়ালে। এত ভীষণ ভাবে চমকে উঠল রবিন, দেখে হাসতে শুরু করল ড্যানি।

'বাঘ,' একটা ঘরের শিক লাগানো দরজা দেখাল সে। 'ডিনারের জন্যে মাংস দেয়া হয়েছে। তোমাদের দেখে হয়তো ভাবছে, ভিন্ন মাংসে রুচি বদল করতে পারলে মন্দ হয় না।'

'আমার চেয়ে ওকেই বেশি পছন্দ করবে,' বুড়ো আঙুল কাত করে কিশোরকে দেখাল রবিন। 'ওর দেশোয়ালি ভাই তো। বাংলাদেশী।'

শিকের ফাঁক দিয়ে বাঘটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। আগের রাতে এটাই বেরিয়ে গিয়েছিল। বাঘটাকে বলল, 'মনে আছে তো মিয়া, তুমি মানুষের মাংস পছন্দ করো না।'

লম্বা লাল জিভ বের করে থাবা চাটছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

ড্যানির পেছন পেছন আরেকটা ছোট ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। শিক লাগানো দরজার তালা খুলে একটা ছোট ঘরে ঢুকল। কংক্রীটের দেয়াল, মোজাইক করা মেঝে।

'এটাই ছিল তুষার চিতার রাতের বাসা,' ড্যানি বলল।

'রাতে আলাদা জায়গায় রাখা হয় কেন জানোয়ারগুলোকে?' শূন্য ঘরটায় চোখ বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'দিনের বেলা যেখানে রাখা হয়, সেখানে ঘুমালে অসুবিধে কি?'

'এটা হলো সাবধানতা। রাতের বেলা কোন মাথা খারাপ লোক চিড়িয়াখানায় ঢুকে জানোয়ারগুলোর ক্ষতি করতে পারে, চুরি করতে পারে। বলা তো যায় না। কিন্তু এখান থেকেও যে চিতাটাকে চুরি করে নিয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল।'

দরজা দিয়ে একটা সরু কুঠুরিতে গোয়েন্দাদের নিয়ে এল ড্যানি। হোসপাইপ, বেলচা আর কিছু টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস আছে এখানে।

একটা হাতলে চাপ দিল ড্যানি। খুলে গেল একটা ইস্পাতের দরজা। 'এসো।'

মাথা নুইয়ে দরজা পার হয়ে অন্যপাশে চলে এল ওরা। সোজা হয়ে দেখল কিশোর, কান্তার হিমালয় পর্বতের পরিবেশে এসে ঢুকেছে।

'সকাল বেলা এই দরজা দিয়ে এখানে বেরিয়ে আসত চিতাটা,' ড্যানি জানাল। 'রাতে আবার ফিরে যেত। দুবার খাবার দেয়া হয় ওদের। একবার সকালে, একবার সন্ধ্যায়।'

'তারমানে কান্তাকে পাওয়ার জন্যে বেশ কয়েকটা তালা খুলতে হয় চোরকে,' রবিন বলল। 'কি করে খুলল?'

'চাবি ছাড়াও তালা খুলতে পারে ওস্তাদ চোরেরা,' ড্যানি বলল। 'কিংবা এমন কেউ কাজটা করেছে, যার কাছে চাবি থাকে।'

তারমানে চিড়িয়াখানার কেউ। চট করে ড্যানির কোমরে ঝোলানো চাবির দিকে নজর চলে গেল রবিনের।

পরের একটা ঘণ্টা ড্যানির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াল দুজনে। কখনও হেঁটে, কখনও জীপে করে; তীক্ষ্ণ নজর রাখল যাতে কোন কিছু চোখ না এড়ায়। প্রথম শিফটের অন্য প্রহরীদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিতে অনুরোধ করল। বাকি পাঁচজনের বয়েস পঁচিশ থেকে সত্তরের মধ্যে। আপাতত পরিচয় করে নিল, পরে ভালমত কথা বলবে।

সাড়ে আটটা নাগাদ অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। জু প্লাজায় ফিরে এল ড্যানি।

'আমার কিছু কাগজপত্রের কাজ আছে,' বলল সে। 'আর কিছু দেখানো লাগবে তোমাদের?'

'আমরা বাইরে ঘুরে বেড়ালে কোন অসুবিধে হবে না তো?' জানতে চাইল রবিন।

'তা ঘুরতে পারো,' নাকের ওপর চশমাটা ঠিক করে বসাতে বসাতে বলল ড্যানি। 'জন্তু-জানোয়ারগুলোকে সব নিরাপদ জায়গায় আটকে ফেলা হয়েছে। আমি রাত দুটো পর্যন্ত আছি। দরকার হলে ডেকো।'

'থ্যাংকস,' বলে লাফ দিয়ে জীপ থেকে নেমে পড়ল রবিন। কিশোরও নামল। অন্ধকারে হাঁটতে শুরু করল। ঝিঁঝি ডাকছে ক্রমাগত। এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কি খুঁজতে এসেছে জানে না। তবে সন্দেহ জাগায় এমন কিছু।

'রাতের বেলা জায়গাটা কেমন গা ছমছমে, ভুতুড়ে বললেও ভুল হবে না,' জলহস্তীর শূন্য জলার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন। 'কিছুই দেখা যাচ্ছে

না। অথচ মনে হচ্ছে হাজারটা চোখ গোপনে তোমাকে লক্ষ করছে।'

হঠাৎ অন্ধকারকে চিরে দিল যেন অদ্ভুত একটা কু-কু শব্দ।

ঝট করে মাথা ঘোরাল কিশোর, 'কিসের ডাক?'

'কি করে বলব? হবে কোন জানোয়ার···পাখিও হতে পারে।'

'সাপের বাড়ির দিকটায় ঘুরে আসি, চলো,' কিশোর বলল। 'অজগরটা যেখান দিয়ে বেরিয়েছে, সেটা আরেকবার ভাল করে দেখতে চাই।'

সাপের বাড়ির কাছে এসে ভেন্টের মুখটার দিকে তাকাল কিশোর।

'একটা জিনিস খেয়াল করেছ?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'প্রতিটি স্যাবটাজ করা হয়েছে উঁচু জায়গা থেকে। এই ভেন্ট, বানরের খাঁচার হট ওয়্যার, বাঘের পরিখার ওপর গাছের ডাল।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'বানরের খাঁচার হট ওয়্যারটা তো একটা কঠিন ব্যাপার। নাগাল পেতে নিশ্চয় রীতিমত কসরত করতে হয়েছে।'

'সাধারণ মইয়ের সঙ্গে বাড়তি ধাপ জুড়ে ওঠা সম্ভব। সিকিউরিটি গার্ডের জন্যে সুবিধা। ওয়ালথ্রপরাও এ কাজের জন্যে ফিট, হালকা-পাতলা আছে, মই বেয়ে উঠতে পারবে।' এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'কিন্তু যদি ডক্টর হেমিং হয়ে থাকেন? তাঁর বয়েস অত কম নয়। এত উঁচুতে কি উঠতে পারবেন?'

'সাহায্য করার জন্যে কাউকে নিলে পারেন। সহকারী।'

ভেন্টের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। কয়েকজন সহকারী নিলেই বা আপত্তি কিসের? তাঁর ফান্ডের টাকা কেড়ে নেয়া হয়েছে···কথাটা মনে পড়তেই উত্তেজিত হয়ে উঠল। রবিনের দিকে তাকাল, 'ডক্টর হেমিঙের তিনজন সহকারীর নাম বলতে পারো?'

একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রবিন। তারপর সে-ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রায় চিৎকার করে বলল, 'ববি, টপ, আর বেবি জুপিটার!'

'কারেক্ট!' চরকির মত পাক খেয়ে রবিনের দিকে ঘুরে গেল কিশোর। 'ডক্টর হেমিং বলেছেন, ওদের দিয়ে যে কোন কাজ করানো সম্ভব। নানান ধরনের টুলসও আছে ওদের খাঁচার মধ্যে। ওগুলো ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন হয়তো। রাতের বেলা জায়গামত নিয়ে গিয়ে, প্রহরীদের অলক্ষে স্যাবটাজগুলো করিয়েছেন। উঁচু জায়গায় চড়া কিছুই না শিম্পাঞ্জির জন্যে।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার,' বিল্ডিঙের পাশের ড্রেনপাইপটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'কিন্তু উড়িয়েও দিতে পারছি না। থিয়োরিটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।'

শিম্পাঞ্জির বিল্ডিঙের কাছে চলে এল ওরা। পরীক্ষা করে দেখল, বাইরের দিকের একটা দরজার তালা খোলা।

'গার্ড থাকতে পারে,' চারপাশে তাকাতে লাগল রবিন।

কাউকে চোখে পড়ল না। ঢুকে পড়ল দুজনে। পা টিপে টিপে ঘুমন্ত গরিলাগুলোর পাশ কাটাল। চলে এল ল্যাবরেটরি-কাম-শিম্পাঞ্জির ঘরের কাছে। কিশোরের পকেটে মাস্টার কী আছে। তালা খোলার জন্যে সেটা বের করতে যাবে, রবিন দেখল তালাটা খোলা।

'অবাক কাণ্ড! খোলা কেন?'

'কাছাকাছি গার্ড আছে বোধহয়,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

ল্যাবরেটরিতে ঢুকল ওরা। টেবিলে রাখা একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। মৃদু আলো। কোন মানুষ চোখে পড়ল না। শিকের ফাঁকে নাক ঠেকিয়ে ওপাশে শিম্পাঞ্জিগুলোকেও দেখতে পেল না রবিন।

'কোথায় ওগুলো?' আস্তে কথা বলার কথা ভুলে গেল সে।

'গাছে,' কিশোর বলল।

গাছের ডালে ওগুলোকে ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে দেখল এতক্ষণে রবিন। গভীর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ চোখ খুলে গেল ববির। চোখের পলকে উঠে বসে জাগিয়ে দিল তার দুই ভাইকে। নিঃশব্দে টপাটপ মেঝেতে নেমে পড়ল তিন শিম্পাঞ্জি।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল কিশোর।

শিম্পাঞ্জিগুলোও অবিকল অনুকরণ করল। যেন কথা বুঝতে পেরেছে।

একটা বুদ্ধি খেলে গেল কিশোরের মাথায়। আলমারিটা দেখিয়ে বলল, 'টুলস! আনতে পারবে ওগুলো?'

চার হাতপায়ে ভর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নামাতে শুরু করল ববি। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে টপ আর জুপিটার। বোঝা গেল, দলের নেত্রী ববি। হাতুড়ি, করাত, রেঞ্চ, প্লায়ার্স, কাঁচি, রুলার, আর কয়েকটা স্ক্রু-ড্রাইভার মেঝেতে নামিয়ে রাখল সে।

'হট ওয়্যার কাটার জন্যে কাঁচি,' রবিন বলল। 'ভেন্টের স্ক্রু খোলা যাবে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে। আর গাছের ডাল কাটার জন্যে করাত। এখন দেখা যাক, টুলসগুলো ঠিকমত চিনতে পারে কিনা ওরা।'

'করাত,' ফিসফিস করে ববিকে বলল কিশোর। হাত সামনে-পেছনে করে করাত দিয়ে কাটার ভঙ্গি করল। 'কাঠ কাটতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল ববি। এক টুকরো কাঠ খুঁজে এনে বাড়িয়ে দিল দুই ভাইয়ের দিকে। তুলে নিল একটা ছোট করাত। দুই ভাই দুদিক থেকে কাঠটা ধরে রাখল, ববি মাঝখানে করাত চালাল। দক্ষ ছুতারের মত কাঠটা কেটে দুই টুকরো করে ফেলল।

'কাণ্ডটা কি করল!' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। 'সম্ভব! ওদের পক্ষে স্যাবটাজ করা সম্ভব!'

কটকট করে শব্দ হলো। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর, পাশের অফিসটার ইলেকট্রনিক লক কেউ খুলে ফেলল ভেবে।

আসলে খুলেছে শিম্পাঞ্জির ঘরের দরজা। রবিন বা কিশোর কিছু করার আগেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে চলে এল ববি; পেছনে তার দুই ভাই। তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে আনন্দে লাফানো শুরু করল। ওরা এখন মুক্ত!

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'নিশ্চয় কেউ ঢুকতে দেখেছে আমাদের। শিম্পাঞ্জিগুলোকে নিয়ে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করতে চেয়েছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল।

সারা ঘরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শিম্পাঞ্জিগুলো। রবিন বলল, 'খাঁচায় ফেরানো দরকার।'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে রবিনের কাছে এসে দাঁড়াল টপ। ওর ডান হাত ধরে ভয়ানক ভাবে ঝাঁকাতে শুরু করল।

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, টপ,' রবিন বলল। বুঝতে পারছে না, শিম্পাঞ্জিটা আসলে খাতির করতে চাইছে, না কুমতলব আছে ওর।

লাফ দিয়ে গিয়ে কিশোরের পিঠে চড়ল ববি।

'আরে, নাম, নাম!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

নামল না ববি। বরং মাথার চুলে হাত বুলাতে শুরু করল। কখন হ্যাঁচকা টান মেরে ছিঁড়ে দেয় এই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল কিশোর।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বদলে গেল শিম্পাঞ্জিগুলোর আচরণ। ডেস্কের ওপরে উঠে লাফাতে শুরু করেছে বেবি জুপিটার। সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ চিৎকার।

রবিনের হাতটা মুচড়ে ধরে ওপরে ঠেলতে শুরু করল টপ।

'আরে, করছিস কি!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'ভেঙে ফেলবি তো!'

চিৎকার-চেঁচামেচি আরও বেড়ে গেল শিম্পাঞ্জিগুলোর। বুনো হয়ে উঠছে ক্রমশ।

কিশোরের ঘাড়টা এক হাতে পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিতে আরম্ভ করল ববি।

'না!' হাতটা সরানোর জন্যে টান দিল কিশোর। ভয়ানক শক্তি শিম্পাঞ্জিটার রোমশ বাহুতে। 'থামা এ সব!' দম আটকে আসছে। 'বন্ধ কর!'

কিন্তু আরও শক্ত হলো ববির হাতের বাঁধন। চাপ বাড়ছে, আরও চাপ, দম আটকে দেবে।

# নয়

দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করছে কিশোর। গলা থেকে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে।

জোরে ককিয়ে উঠল রবিন। চিৎকার করে বলল, 'উফ্, হাতটা ভেঙে দিল আমার।'

কল্পনাই করতে পারেনি, জানোয়ারটার শরীরে এই পরিমাণ শক্তি, যদিও ডক্টর হেমিং আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন।

বেবি জুপিটারও শয়তানিতে কম যায় না। টেবিল থেকে কাগজপত্র তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে বাতাসে। মজা পেয়ে বুনো চিৎকার করছে তিনটে শিম্পাঞ্জিই, বানর প্রজাতির আদিম আনন্দ।

'রবিন···চিড়িয়াখানার বন্ধু···বার বার বলতে থাকো,' গলায় চাপ নিয়ে কোনমতে বলল কিশোর।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল রবিন। শিম্পাঞ্জিগুলোকে বোঝাতে হবে, চিড়িয়াখানার জন্যে সে আর কিশোর খুব মূল্যবান প্রাণী, ওদের ক্ষতি করা চলবে না।

'চিড়িয়াখানার বন্ধু!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'মনে আছে, আমরা চিড়িয়াখানার বন্ধু! আমরা টাকা দিই!'

কেয়ারই করল না শিম্পাঞ্জিগুলো। অসহায় হয়ে তাকিয়ে দেখল রবিন, কিশোরের গলায় ববির হাতের চাপ শক্ত হলো আরও। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে।

'ইশারায় বোঝাও···' ঘড়ঘড় করে কোলাব্যাঙের স্বর বেরোল কিশোরের গলা থেকে, চাপ বাড়িয়ে সেটাও আটকে দিল ববি।

'বোঝাচ্ছি!' হাতটা বাঁকা হয়ে আরেকটু ওপরে উঠে যেতে ব্যথায় কাতরে উঠল রবিন। এর মাঝেও মুক্ত হাতটা তুলে ববির দিকে নাড়তে লাগল, যতক্ষণ না তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল। ডক্টর হেমিঙের অনুকরণে ইশারা করে বোঝানোর চেষ্টা করল, ওরা চিড়িয়াখানার বন্ধু। ভাগ্যিস, আগের দিন ভালমত দেখেছিল কি করে ইশারা করেন ডক্টর হেমিং।

ববির চোখ রবিনের ওপর স্থির। মরিয়া হয়ে ইশারা চালিয়ে যেতে লাগল রবিন, সেই সাথে চিৎকার করে বার বার বলতে লাগল, 'চিড়িয়াখানার বন্ধু! চিড়িয়াখানার বন্ধু! চিড়িয়াখানার বন্ধু!'

অবশেষে কমে এল ববির তীক্ষ্ণ কিচকিচ শব্দ। গলায় চাপ কমে এল কিশোরের। হাঁ করে বাতাস যেন গিলতে শুরু করল সে। পিঠ থেকে নেমে টপের কাছে এগিয়ে এল ববি। হাতের আঙুলের সাহায্যে 'চিড়িয়াখানার বন্ধু' সঙ্কেত দিয়ে ভাইকে টেনে সরাল রবিনের কাছ থেকে।

ব্যথা করছে ডান হাতটা। ডলতে ডলতে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'গেছিলাম আরেকটু হলেই।'

'হ্যাঁ,' অফিসের দিকে তাকাল কিশোর। 'আর কেউ আছে নাকি দেখা দরকার। তুমি উঁকি দিয়ে এসো, আমি শিম্পাঞ্জিগুলোকে সামলাচ্ছি।'

টেবিলের ওপর এখনও নাচানাচি করছে বেবি জুপিটার। তীক্ষ্ণ হাঁক ছাড়ছে: ইহ্! ইহ্! ইহ্! কাগজ ছুঁড়ে দিচ্ছে বাতাসে। ভাই-বোনকে চুপ হয়ে যেতে দেখে হতাশ হয়েছে। দ্বিধায় পড়ে গিয়ে থুঁতনি চুলকাতে লাগল।

অফিসের দিকে রওনা হলো রবিন। শিম্পাঞ্জিগুলোকে আবার খাঁচায় ফেরত পাঠানোর উপায় ভাবছে কিশোর।

'টাকা!' মানিব্যাগ থেকে ডলারের নোট বের করে দেখাল কিশোর। চিড়িয়াখানার বন্ধুরা যে টাকা দেয়, নোট দেখিয়ে সেটা বোঝাতে চাইল। শিম্পাঞ্জিগুলো টাকা চিনলে হয় এখন।

তিনটে এক ডলারের নোট শিকের ওপাশে রাখল সে।

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটল শিম্পাঞ্জি তিনটে। সোজা গিয়ে ঢুকল খাঁচার মধ্যে। একেকজন একটা করে নোট তুলে নিয়ে দেখতে লাগল। এক মুহূর্ত দেরি না করে শিক লাগানো দরজাটা টেনে দিল কিশোর। কট করে লেগে গেল স্বয়ংক্রিয় তালা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

'নাহ্, কেউ নেই এখানে,' বলল অফিসের দরজায় দাঁড়ানো রবিন। 'অফিস থেকে হলওয়েতে বেরোনোর আরেকটা দরজা আছে। আমাদের অলক্ষে সেটা দিয়ে ঢোকা আর বেরোনো সম্ভব ছিল।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। নিচু হয়ে মেঝে থেকে কুড়াতে শুরু করল বেবি জুপিটারের ছড়িয়ে ফেলা কাগজগুলো। 'আমরা যখন ঢুকলাম, হয়তো ডক্টর হেমিং

তখন অফিসেই ছিলেন। মনে আছে, ল্যাবের দরজা খোলা পেয়েছি আমরা। হয়তো তিনি আমাদের জানতে দিতে চাননি টুলসগুলো কি নিখুঁত ভাবে ব্যবহার করতে পারে শিম্পাঞ্জি।'

'স্যাবটাজে খুব চমৎকার ভাবে সহায়তা করতে পারবে এই শিম্পাঞ্জিগুলো,' হাতটা এখনও ডলছে রবিন। 'যা বুঝলাম, তাতে মনে হলো এ কাজ করার জন্যে স্পেশাল ট্রেনিং দেয়া হয়েছে এদের।'

'ডক্টর হেমিঙের রয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের ওপর তীব্র আক্রোশ।' কাগজগুলো টেবিলে রাখল কিশোর। 'তারমানে মোটিভ আছে।'

শিম্পাঞ্জিগুলোর দিকে ফিরে দেখল কিশোর, নোটগুলোকে চিবাচ্ছে এখন ওরা।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে রবিনও তাকাল। 'গেল তোমার তিনটে ডলার।'

'প্রাণের বিনিময়ে তিনটে ডলার বড়ই কম!' অন্যমনস্ক হয়ে গেছে হঠাৎ কিশোর।

আরও মিনিট কয়েক পর এপ বিল্ডিং থেকে বাইরে চিড়িয়াখানার নির্জন চত্বরে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। মৃদু বাতাস সরসর করে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল গাছের পাতা। আকাশে মেঘ ডাকল গুড়ুগুড়ু শব্দে।

'চলো, কিছু খেয়ে নেয়া যাক,' রবিন বলল। 'শিম্পাঞ্জিগুলো খিদে বাড়িয়ে দিয়েছে আমার।'

'চলো। আজ রাতের জন্যে চিড়িয়াখানা দেখা যথেষ্ট হয়েছে। কাল সকালে উঠে এয়ারপোর্টে যাব ওয়ালথ্রপরা কি নিয়ে মেতেছে দেখার জন্যে।'

পার্কিং লটের দিকে এগোচ্ছে দুজনে, একটা ভুতুড়ে চিৎকার চিরে দিল রাতের নিস্তব্ধতা।

'কিসের ডাক?' অন্ধকারে চারপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল রবিন। আনমনে বিড়বিড় করল, 'নাহ্, জঙ্গলের চেয়ে কোন অংশে কম নয় চিড়িয়াখানা!'

ন'টা বাজার সামান্য আগে রকি বীচ এয়ারপোর্ট টার্মিনাল বিল্ডিঙে ওয়ালথ্রপদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল দুই গোয়েন্দা। দুই হাতে পত্রিকার পাতা ছড়িয়ে ধরে তার আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। বড় করে হেডলাইন দিয়েছে: রকি বীচ চিড়িয়াখানা থেকে তুষার চিতা উধাও।

কিশোর বলল, 'সিকিউরিটি গার্ডদের সঙ্গে তো তেমন আলাপ হলো না, ড্যানি বাদে। ওকে বেশ আন্তরিকই মনে হয়েছে, তবে...'

'তবে কি?' দরজার দিক থেকে চোখ সরাল না রবিন।

'শিম্পাঞ্জির ব্যাপারে অনেক কিছু জানে সে, এটা তোমার খটকা লাগেনি? কি করে সেদিন ডক্টর হেমিঙের অফিসে ঢুকে পড়েছিল, মনে করে দেখো। শিম্পাঞ্জির প্রিয় টিভি শো কোনটা, তাও জানে। স্যাবটাজ করতে ডক্টর হেমিঙকে সাহায্য করেনি সে, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। ওর দিকে নজর দেয়া দরকার...'

'এসে গেছে আমাদের রায়না আর নিক!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

পত্রিকার পাতাটা ইঞ্চি দুয়েক নামিয়ে সাবধানে চোখ দুটো বের করল কিশোর। টার্মিনাল বিল্ডিঙে ঢুকল ওয়ালথ্রপরা। প্যাসিফিক এক্সপোর্টার লেখা কাউন্টারের

স। ‍ে গিয়ে দাঁড়াল। কাউন্টারে বসা এক যুবকের সঙ্গে কথা বলতে লাগল রায়না। কয়েকটা কাগজ বের করে দিল যুবক। কি যেন লিখতে শুরু করল নিক।

'কি লিখছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'বুঝতে পারছি না।'

কথা বলতে বলতে দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিল যুবক।

'বাক্সটা কতবড় বোধহয় বোঝাচ্ছে লোকটা,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'কান্তার বাক্স।'

'মনে হয়

মিনিটখানেক পর কাউন্টারের কাছ থেকে সরে গেল ওয়ালথ্রপরা। দরজার দিকে এগোল।

'চলো, পিছু নিই,' কিশোর বলল।

কিশোর বলার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে রবিন।

বাইরে পার্কিং লটে দেখা গেল ওয়ালথ্রপদে‍ র মলিন সবুজ গাড়িটা।

আচমকা বজ্রের বিকট শব্দ হলো মাথার ওপর।

'মনে হয়,' রবিন বলল, 'ঝড়টা আসার সময় হয়ে গেছে।' আকাশের দিকে চোখ তুলল। কালো মেঘের টুকরোগুলো দ্রুত একজোট হচ্ছে; যেন সেনাবাহিনীর একটা দল যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পার্কিং লট থেকে ওয়ালথ্রপদের গাড়িটা বেরিয়ে যেতে, কিশোররাও এসে ওদের গাড়িতে উঠল।

'পিছু নেব নাকি?' স্টার্ট দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তা তো নেবেই।'

'মনে হচ্ছে ওয়ালথ্রপরাই চিতাটাকে চুরি করেছে। এখন পাচার করার ব্যবস্থা করেছে কোনখানে। নিশ্চয় হিমালয়ে ফেরত পাঠাচ্ছে।' গিয়ার দিয়ে শেভ্রলেটার পিছু নিল রবিন। 'কিন্তু চিতা চুরির সঙ্গে চিড়িয়াখানায় স্যাবটাজের সম্পর্ক কি?'

'আমার ধারণা,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর, 'দুটো সম্পূর্ণ আলাদা দুটো অপরাধের ঘটনা। একটার সঙ্গে আরেকটার কোন সম্পর্ক নেই।'

আর কিছু না বলে নীরবে গাড়ি চালাল রবিন। আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে এগিয়ে নির্জন একটা গলিতে ঢুকল শেভ্রলে। পথের ধারে জানালাশূন্য সারি দেয়া বড় বড় বিল্ডিং। একজন মানুষকেও চোখে পড়ল না।

'গুদাম,' রবিন বলল।

রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে থামল সবুজ শেভ্রলে। কোণের কাছে একটা বাড়ির আড়ালে গাড়ি সরিয়ে নিল রবিন। নজর রাখল ওয়ালথ্রপদের ওপর। গাড়ি থেকে নেমে একটা গুদামের দিকে এগিয়ে গেল নিক আর রায়না। দুজনের হাতেই একটা করে প্লাস্টিকের ব্যাগ।

'কি করছে?' বিড়বিড় করল কিশোর।

গুদামের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল নিক। দেখে নিল কেউ আছে কিনা। ছোট একটা বাক্সের মত জিনিস বের করে দরজায় আটকে দিয়ে সরে এল।

'কি ওটা?'

রবিনের কথা শেষ হতে না হতেই বুম করে শব্দ হলো।

'বোমা!' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে কিশোরের। 'সন্ত্রাসী নাকি এরা!'

কোথায় যেন একটা অ্যালার্ম বেজে উঠল। গুদামের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওয়ালথ্রপরা।

'রবিন, তুমি বসো। কি করে ওরা, দেখে আসি।'

রবিন কিছু বলার আগেই ঠেলা মেরে দরজা খুলে নেমে গেল কিশোর। দৌড় দিল গুদামের দরজার দিকে।

ঠিক এই সময় ঝুপঝুপ করে নামল বৃষ্টি। অকস্মাৎ। মুষলধারে। উইন্ডশীল্ড বেয়ে গড়াতে লাগল পানির ধারা। মুহূর্তে বৃষ্টির চাদরে ঢেকে দিল এমন ভাবে, সে-চাদর ভেদ করে সামনের কিছুই দেখা সম্ভব হলো না। ওয়াইপার চালু করে দিল রবিন।

অপেক্ষা করতে লাগল সে। অপেক্ষা। অপেক্ষা। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসও রয়েছে। ঝরাৎ ঝরাৎ করে এসে বাড়ি মারছে গাড়ির গায়ে, বিল্ডিঙের দেয়ালে।

বসে থাকতে থাকতে রবিনের মনে হলো, অনন্তকাল ধরে চলছে ওয়াইপার দুটো। কিছুই ঘটছে না। কিশোরও আসছে না, ওয়ালথ্রপরাও বেরোচ্ছে না। স্টিয়ারিঙে টোকা দিতে লাগল তার অস্থির আঙুলগুলো।

ঘড়ি দেখল। মাত্র দশ মিনিট পেরিয়েছে। অথচ রবিনের মনে হচ্ছে দশ যুগ। গুদামের মধ্যে কি করছে ওয়ালথ্রপরা? ব্যাগে করে কি নিয়ে গেছে?

আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের একটা সর্পিল শিখা। অবশেষে গুদাম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল দুই ওয়ালথ্রপকে। দরজার কাছে দাঁড়াল একটা মুহূর্ত। শেডের নিচে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টি পড়ছে না গায়ে। ব্যাগ দুটো এখন রায়নার হাতে। রুমাল দিয়ে হাত মুছছে নিক।

চোখ কুঁচকে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তুলে বোঝার চেষ্টা করছে রবিন, কি মুছছে নিক। লাল রঙ মনে হলো। রক্ত না তো! ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। কিশোরের কিছু হলো!

বাজ পড়ল আবার। গাড়ির দিকে দৌড় দিল ওয়ালথ্রপরা। মাথা নিচু করে এক দৌড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে। ছেড়ে দিল গাড়ি।

একটা মুহূর্তও আর দেরি করল না রবিন। প্রবল ঝড়ের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিল গুদামের দরজার দিকে। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা এসে ঢুকল ভেতরে।

বিরাট একটা অন্ধকার জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। 'কিশোর!' গলা চড়িয়ে ডাকল, 'কোথায় তুমি?'

জবাব নেই।

দুরুদুরু করছে বুকের মধ্যে। দেয়াল হাতড়ে সুইচ বোর্ডটা বের করল সে। আলো জ্বেলে দিল। মাথার ওপর জ্বলে উঠল উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট লাইট।

গুদামের জিনিসপত্র দেখে, দম আটকে আসতে চাইল রবিনের। র‍্যাকে বোঝাই নানা রকম ফারের কোট–মিঙ্ক, শেয়াল, স্যাবল আর চিনচিলার রোমশ

চামড়ায় তৈরি। কয়েকটা কোটের গায়ে রক্তের ফোঁটা দেখতে পেল।

'কিশোর!' আবার চিৎকার করে ডাকল সে।

এবারেও সাড়া মিলল না। মনে হলো হৃৎপিণ্ডটা বুঝি থেমে যাবে, যখন দেখল মেঝেতে পড়ে থাকা ছোপ ছোপ রক্ত।

রক্তের দাগ ধরে ধরে, কোটের র‍্যাকের মাঝখানের গলিপথ ধরে গুদামের পেছন দিকে চলে এল রবিন। একটা র‍্যাক কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখল এখানে। সমস্ত কোট ছড়িয়ে আছে মেঝেতে।

তাকে চমকে দিয়ে নড়ে উঠল একটা কোট। ভুল দেখছে নাকি! ভূত!

'কিশোর?' সাবধানে ডাকল রবিন।

চাপা একটা শব্দ শুনে উবু হয়ে বসল। কোট সরাতে শুরু করল। নিচে চাপা পড়ে আছে কিশোর। মেঝেতে পড়ে আছে।

'সর্বনাশ!' কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল রবিন। সারা মুখ, মাথা রক্তে মাখামাখি।

'আমার কিছু হয়নি,' মাথা তুলল কিশোর। গুঙিয়ে উঠল। 'সত্যি বলছি।'

'তোমার মুখে রক্ত কেন? গোঙাচ্ছ কেন?'

'মাথার চামড়া কেটে গেছে,' উঠে বসল কিশোর। 'রক্ত না। রঙ।'

'র-র-র…'

'হ্যাঁ, রঙ,' কিশোর বলল। 'ওয়ালথ্রপদের সৌজন্যে। চামড়ার জন্যে জানোয়ার মারা চলবে না—প্রতিবাদ জানাতে এসেছিল ওরা।' দেয়ালের দিকে হাত তুলল সে। 'দেখো, ওদের প্রতিবাদের নমুনা। কি লিখে রেখে গেছে দেখো।'

বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখেছে: এই জানোয়ারগুলোকে খুন করা হয়েছে! লেখাগুলো থেকে দেয়াল বেয়ে রক্তের মত কাঁচা রঙ নামছে এখনও। বড় বড় লোম আর শাখাপ্রশাখা তৈরি করেছে যেন অক্ষরগুলোর। ভীতিকর দৃশ্য।

'সঙ্গে করে রঙের টিন নিয়ে এসেছিল ওরা,' কিশোর বলল। 'রায়না লিখছিল, নিক রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছিল কোটের ওপর। র‍্যাকের আড়ালে লুকিয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। পেছনে সরতে গিয়ে কিসে যেন পা দিয়ে বসলাম, শব্দ হয়ে গেল, তেড়ে এল ওরা। দেখে ফেলল। মাথা ঘুরিয়ে রেখেছিলাম, যাতে মুখ না দেখে। আমার মাথায় রঙের টিন ছুঁড়ে মারল নিক। ঠেলা মেরে গায়ের ওপর ফেলে দিল র‍্যাকটা। চাপা পড়লাম তার নিচে। কপাল ঠুকে গিয়েছিল সম্ভবত। বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম।'

ব্যথা লাগা জায়গাগুলোতে আঙুল বোলাল সে। 'এখন আমরা জানি, জানোয়ারের আইন রক্ষার জন্যে নির্দ্বিধায় মানুষের আইন ভাঙছে ওয়ালথ্রপরা।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। বিচিত্র চেহারার লেখাগুলোর দিকে তাকাল আবার। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'চলো, বাড়ি যাই।'

# দশ

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকল গাড়ি। বাড়ির সামনে না গিয়ে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপের পাশে গাড়ি রাখল রবিন। রঙটঙগুলো এখান থেকেই ধুয়ে না গেলে, মেরিচাচী দেখলে শুরু করবেন চেঁচামেচি। হয়তো রক্ত ভেবে বসবেন। কৈফিয়ত দিতে দিতে জান যাবে। কে যায় অত ঝামেলা করতে।

ওঅর্কশপের একপ্রান্তের টিনের বেড়ায় একটা ধাতব বেসিন লাগানো আছে। পেট্রলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে রঙগুলো প্রথমে ডলে তুলতে শুরু করল দুজনে। তারপর সাবান দিয়ে ধোবে।

মিনিট পাঁচেক পর হন্তদন্ত হয়ে ওঅর্কশপে ঢুকল মুসা। বৃষ্টিতে ইঁদুর ভেজা হয়ে এসেছে। কাপড় থেকে টপটপ করে পানি ঝরছে।

'কি ব্যাপার?' একই সঙ্গে প্রশ্ন করল কিশোর আর রবিন।

হাঁপাচ্ছে মুসা।

'দৌড়ে এলে নাকি?' আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, সাইকেল!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'রাজকুমারী!'

'কি হয়েছে রাজকুমারীর?...আচ্ছা, বসো, শান্ত হও। তারপর বলো।'

একটা টুলে বসে পড়ল মুসা। শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না। 'আজ সকালে ডরমিটরি থেকে চন্দ্রাবতীকে তুলে নেয়ার কথা ছিল আমার। তাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যেতাম। কিন্তু গিয়ে দেখি, চন্দ্রাবতী নেই।'

'তোমাকে ছাড়াই হয়তো চিড়িয়াখানায় চলে গেছে,' কিশোর বলল।

'না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল মুসা। 'চিড়িয়াখানায়ও গিয়েছি। ওখানে যায়নি সে।'

'কোন কারণে অন্য কোথাও গিয়েছে হয়তো।'

'আমার মনে হয় না। ডরমিটরিতে আমার পরিচিত একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। আজকে দুজনের বাজারে যাওয়ার কথা ছিল, জরুরী কিছু জিনিসপত্র কিনতে। চন্দ্রাবতীই বলে রেখেছিল। সে-ব্যাপারেই কথা বলতে তার ঘরে গিয়েছিল মেয়েটা। চন্দ্রাবতীকে ঘরে পায়নি। কাল বিকেলের পর থেকে কেউ আর দেখেওনি ওকে।'

'হুম!' ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'মোটেও ভাল মনে হচ্ছে না আমার কাছে!'

'গাড়িটা স্টার্ট নিতে চাইল না,' মুসা বলল। 'সারানোর সময় ছিল না। একজন গার্ডের সাইকেলটা ধার নিয়ে ছুটলাম থানায়। পুলিশকে জানিয়েছি। ইয়ান ফ্লেচার অফিসে নেই। ডিউটি অফিসার প্রশ্ন করে করে প্রচুর সময় নষ্ট করেছে আমার।...কিশোর, কিছু একটা করা উচিত আমাদের। জলদি জলদি!'

'এক মিনিট, কাপড়টা বদলে নিই।' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, তোমারগুলোও বদলে আমার একটা শার্ট আর প্যান্ট পরে নিতে পারো।'

মুসা বলল, 'আমার বদলানো লাগবে না। গাড়িতে যেতে যেতে শুকোবে। জলদি করো।'

দশ মিনিট পর আবার রাস্তায় নামল রবিনের গাড়ি। সে চালাচ্ছে। পেছনের সীটে বসেছে মুসা আর কিশোর।

মুসা বলছে, 'কে রাজকুমারীকে চুরি করেছে, আমি জানি। ওই শয়তান ছেলেটা, যে তার ওপর নজর রেখেছিল, কাল পিছু নিয়েছিল।'

'আমি ভাবছি,' কিশোর বলল, 'ছেলেটার ব্যাপারে কি লুকাচ্ছিল চন্দ্রাবতী?'

'বলতে হয়তো ভয় পাচ্ছিল, যদি ছেলেটা কিছু করে বসে। হয়তো কোন কারণে তাকে হুমকি দিয়ে রেখেছে ছেলেটা।'

'কিন্তু কেন করবে কিডন্যাপ?'

'আমি কি করে জানব?' হাত ওল্টাল মুসা। 'হয়তো রাজনৈতিক কোন ব্যাপার। চন্দ্রাবতী রাজার মেয়ে, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ঘটতেই পারে।'

'তা পারে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'অ, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি তোমাকে; চিড়িয়াখানার সিকিউরিটি গার্ড ড্যানি হাওয়ার্ডের ব্যাপারে কতটা জানো?'

'একবার মাত্র কথা হয়েছে আমার সঙ্গে,' মুসা বলল। 'ভাল লোক বলেই তো মনে হয়েছে। দেয় চিড়িয়াখানা পাহারা, কিন্তু নেশা অন্য কিছুতে—ও একজন শখের জীববিজ্ঞানী। ডক্টর হেমিঙের সহকারী। কিন্তু তাকে রাখতে পারছেন না আর ডক্টর হেমিং, ফান্ডের অভাবে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।'

'তাই নাকি?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিটা চলে গেল কিশোরের। 'টাকার অভাবে একজন সহকারীকে বিদেয় করে দিতে হচ্ছে, বলেছেন। তারমানে ড্যানিকেই।' চট করে দ্রুত আরেকবার চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। 'এবং তারমানে চিড়িয়াখানায় স্যাবটাজ করার পেছনে তারও যথেষ্ট মোটিভ আছে।'

'কিন্তু রাজকুমারী আসছে কি করে এর মধ্যে?' আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসতে চাইল মুসা।

'জানি না,' আনমনে মাথা নাড়ল কিশোর, 'এখনও বলা যাচ্ছে না কিছু।'

একটা হাই-রাইজ ডরমিটরি বিল্ডিঙের পার্কিং লটে গাড়ি ঢোকাল রবিন।

নেমে পড়ল তিনজনে।

ডরমিটরির লবিতে সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলো ওদের, যে মুসার পরিচিত। ওদেরকে ওপরতলায় নিয়ে গেল সে। চন্দ্রাবতীর ঘরের একটা বাড়তি চাবি জোগাড় করে দিল অফিস থেকে।

মেয়েটাকে ধন্যবাদ আর কাজ শেষ হলে চাবিটা ফেরত দেয়ার কথা বলে চাবি হাতে চন্দ্রাবতীর ঘরের দিকে এগোল মুসা। সঙ্গে কিশোর আর রবিন।

তালা খুলল মুসা। ছোট, চমৎকার আসবাবপত্রে সাজানো, গোছানো একটা ঘরে ঢুকল ওরা। বিছানা, ড্রেসার, ডেস্ক, চেয়ার—সব জিনিসই খুব দামী। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সস্তা জায়গায় একজন রাজকুমারী থাকবে না। দেয়ালে ঝোলানো একটা বিখ্যাত রক গ্রুপের ছবি। বিছানাটা পাতা। জিন্নিসপত্র সব যেটা যেখানে থাকার কথা, রয়েছে; গোছগাছ করা।

'ধস্তাধস্তির তো কোন চিহ্ন দেখছি না,' চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল কিশোর। 'তাকে যদি এখান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে, খুব চতুরতার সাথে কাজটা করেছে।'

'হুঁ।' ডেস্কের ওপর একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি চোখে পড়ল রবিনের। 'ওর চিতাটাকে যে ভাবে সরিয়েছে।'

প্রথমে ঘরটায় ভালমত চোখ বোলাল কিশোর। তারপর যাতে আঙুলের ছাপ না পড়ে কোথাও সেজন্যে হাতে একটা রুমাল জড়িয়ে গিয়ে ডেস্কের ড্রয়ার ধরে টান দিল, 'আশা করি, এ ভাবে জিনিসপত্র ঘাঁটছি, তাতে রাজকুমারী কিছু মনে করবে না।'

'কি খুঁজছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'জানতে চাই, ছেলেটার সঙ্গে কি সম্পর্ক রাজকুমারীর।'

'আমার কথা বলছ নাকি?' দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ; ইংরেজিতেই বলেছে, কিন্তু কথায় ভারী স্বদেশী টান।

ঝটকা দিয়ে হাতলের কাছ থেকে হাতটা সরিয়ে আনল কিশোর। ঝুঁকে থাকা ভঙ্গিতেই মাথা ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। সেই রহস্যময় ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছে তার চোখের তারা। আস্তে একটা পা রাখল ভেতরে। ডান হাতটা পেছনে। হাতে কিছু আছে।

'এখানে কি তোমার?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল মুসা।

'আমি কথা বলছি,' হাত তুলে মুসাকে থামাল কিশোর, যদি কোন অঘটন ঘটিয়ে বসে এই ভয়ে। ছেলেটা কতখানি বিপজ্জনক, হাতে পিস্তল-টিস্তল আছে কিনা আগে জানা দরকার।

'এখানে আমার আসার অধিকার আছে,' চোখের তারার মতই আগুন লেগেছে যেন ছেলেটার গলার স্বরেও। 'প্রশ্নটা বরং আমি করতে পারি—তোমরা এখানে কি করছ?'

রেগে উঠল মুসা, 'তুমি জিজ্ঞেস করার কে? তুমি তো কিডন্যাপ করেছ চন্দ্রাবতীকে! করোনি?'

'খবরদার! বাজে কথা বলবে না!' এগিয়ে এল ছেলেটা। ডান হাতটা সামনে আনল। হাতে ধরা ভোজালীর মত এক ছুরি। হাতলটা হাতির দাঁতে তৈরি। বাতাসে কোপ মারল সে।

ঝিক করে উঠল ঝকঝকে বাঁকানো ফলাটা।

# এগারো

'এ সব করে ভয় দেখাতে পারবে না আমাদের,' সামনে ছুটে গেল মুসা।

'খবরদার!' চিৎকার করে উঠল ছেলেটা। 'আগে বাড়বে না বলে দিলাম!' আবার বাতাসে কোপ মারল সে।

হম্বিতম্বিতে আরও রেগে গেল মুসা। 'নিকুচি করি তোর ভোজালীর!' বলে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল সামনে। ছেলেটা ছুরি চালানোর আগেই তার কব্জি চেপে ধরে মারল প্রচণ্ড এক মোচড়। ব্যথায় ককিয়ে উঠল ছেলেটা। হাত থেকে খসে পড়ে গেল ছুরি।

বাধা দেয়ার কোন সুযোগই ওকে দিল না মুসা। হাত ধরে ঠেলে নিয়ে গেল দেয়ালের কাছে। চেপে ধরল দেয়ালের সঙ্গে। 'জলদি বলো, কেন এসেছ?'

কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। মুসার মত রাগেনি সে। শান্তকণ্ঠে মুসার কথার প্রতিধ্বনি করল, 'হ্যাঁ, বলো, কেন এসেছ?'

ছাড়া পাওয়ার জন্যে জোরাজুরি শুরু করল ছেলেটা। এগিয়ে এসে তার অন্য হাতটা চেপে ধরল রবিন।

'ছাড়ো আমাকে, ছেড়ে দাও!' চিৎকার করে বলল ছেলেটা। 'তোমরা কেন এসেছ, আগে সেকথা বলো!'

'আমাদের সন্দেহ, রাজকুমারীকে কিডন্যাপ করা হয়েছে,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা। সত্র খুঁজতে এসেছি। সে কোথায় আছে, তুমি কি কিছু বলতে পারো?'

'কিডন্যাপ!' জোরাজুরি থামিয়ে দিল ছেলেটা। 'চন্দ্রাবতীকে কিডন্যাপ!' তার চোখে শঙ্কার ছায়াটা আসল বলেই মনে হলো কিশোরের। 'সত্যি বলছি, আমি কিচ্ছু জানি না!'

'আমরা কে সেটা তো শুনলে। এখন বলো তো, তুমি কে?'

'আমার নাম রত্নসূর্য ভানুস্বামী,' গর্বিত ভঙ্গিতে বলল ছেলেটা।

'মাশআল্লাহ্!' বাঁকা হাসি হাসল মুসা, 'নাম তো বাগিয়েছ একখান ভালই। একনাগাড়ে দশ বার বললে এক জগ পানি খাওয়া লাগবে।'

হাত নেড়ে মুসাকে চুপ করতে ইশারা করল কিশোর। ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, 'চন্দ্রাবতীর পেছনে লেগেছ কেন?'

'চন্দ্রাবতী আমার বাগদত্তা। আমেরিকায় পড়ার জন্যে জেদ ধরল সে। বাধ্য হয়ে ওর বাবা এখানে পাঠিয়েছেন। আমার বাবাও এখানে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে, লেখাপড়াও করব, সেই সঙ্গে চন্দ্রাবতীকেও পাহারা দিতে পারব। ঠিক হয়েছে, লেখাপড়া শেষ হলে দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের বিয়ে হবে। সব ভালই চলছিল, কিন্তু মাসখানেক আগে থেকে কেমন নীরস আচরণ শুরু করল চন্দ্রাবতী। আমার সঙ্গে আর হেসে কথা বলে না, এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। এ নিয়ে আলোচনা করতে চাইলাম ওর সঙ্গে, সেজন্যেই সেদিন পেছন পেছন গিয়েছিলাম। কিন্তু কোনমতেই সে কথা বলতে চাইল না আমার সঙ্গে।'

'আমাদের এ কথা বলল না কেন সে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'হয়তো সঙ্কোচ। ব্যক্তিগত কথা বলতে বাধছিল তার,' জবাব দিল ভানুস্বামী। 'তোমরা ওর নতুন বন্ধু। কিছুদিন গেলে হয়তো বলত।'

'ওর যদি বন্ধুই হই আমরা, যদি বোঝো,' মেঝেতে পড়ে থাকা ছুরিটা দেখাল কিশোর চোখের ইঙ্গিতে, 'আমাদের মারতে এলে কেন?'

দ্বিধা করল ভানুস্বামী। 'দেশে আমাকে ভানু বলে ডাকে সবাই। ইচ্ছে করলে

তোমরাও শর্ট করে ডাকতে পারো।' মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল। 'ছেড়ে দিলে শান্তিতে বলতে পারতাম।'

কিশোরের দিকে তাকাল দুজনে। মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ছেড়ে দিয়ে সরে এল মুসা আর রবিন।

মুসার দিকে তাকাল ভানু। কব্জি ডলতে ডলতে বলল, 'উফ্, ভেঙেই দিয়েছিলে! এত জোরে কেউ মোচড় দেয়।'

মুচকি হাসল রবিন। ভয় দেখাল, 'কাজেই বোঝো। কোন রকম চালাকি করতে যেয়ো না আর। ভয়ানক বদমেজাজী ও। বেশি খেপে গেলে আমি আর কিশোর মিলেও ঠেকাতে পারব না। কত মানুষের ঘাড় মটকেছে ও।'

চোখ বড় বড় করে মুসার দিকে তাকিয়ে রইল ভানু। মাথা নাড়ল, 'না, আর ওকে ছুরির ভয় দেখাব না। বিশ্বাস করো।'

কিশোরও হেসে ফেলল। রত্নখচিত, হাতির দাঁতে তৈরি ছুরির ফলাটার ওপর দৃষ্টি আটকে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। ভানুর দিকে তাকাল, 'ছুরিটা কিন্তু সুন্দর।'

'ওটা আমার দাদার জিনিস,' ভানু বলল। 'ছোটবেলা থেকেই আমার খুব প্রিয়। আসার সময় দাদা তাই আমাকে উপহার দিয়েছে। আমি আজকে নিয়ে এসেছিলাম চন্দ্রাবতীকে উপহার দেয়ার জন্যে। আর তোমাদের মারা তো দূরের কথা, ভয় দেখানোরও কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। তাই তো লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এমন সব কথা বলা শুরু করলে...' দ্বিধা করল সে। 'তা ছাড়া তোমাদের ওপর জেলাসও হয়ে গিয়েছিলাম আমি। আমার চেয়ে চন্দ্রাবতী তোমাদের বেশি পছন্দ করছে দেখে...'

'তোমার সঙ্গে যে ওর বাগদান হয়েছে, তার প্রমাণ কি?' ভুরু নাচাল রবিন।

'ডেস্কের ওপরের ড্রয়ারে একটা ফটোবুক পাবে। ইচ্ছে করলে দেখতে পারো ওটা।'

হাতে রুমাল জড়িয়ে রেখেই ড্রয়ারটা টেনে খুলল কিশোর। অ্যালবামটা নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল। পরিবারের সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে আর তুষার চিতাটার সঙ্গে তোলা প্রচুর ছবি রয়েছে চন্দ্রাবতীর। পর পর কয়েকটা পাতায় পাওয়া গেল ভানুর সঙ্গে তোলা বেশ কয়েকটা ছবি। কোনটাতে পরিবারের লোক রয়েছে, কোনটাতে দুজনে একা।

মুখ তুলল কিশোর, 'ও সত্যি কথাই বলছে। অন্তত ছবি দেখে সে-রকমই মনে হচ্ছে। এখন চন্দ্রাবতী যদি ওকে পছন্দ না করে, আমাদের কিছু করার নেই।'

ছুরিটা তুলে নিল ভানু। 'যাই। চন্দ্রাবতীকে যে পাওয়া যাচ্ছে না, পুলিশকে জানানো দরকার। এ দেশে আসাই উচিত হয়নি আমাদের। তাহলে আর এই অঘটন ঘটত না।'

বেরিয়ে গেল ভানু।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'ওর কথা বিশ্বাস করেছ?'

'বাগদত্তা হলেও,' রবিন বলল, 'ইদানীং যেহেতু চন্দ্রাবতী আর ওকে পছন্দ করতে পারছে না, রাগের মাথায় সে-কারণেও তাকে কিডন্যাপ করে বসতে পারে ভানু; কি বলো, কিশোর?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার মনে হয় সত্যি কথাই বলেছে সে। মুসা, তুমি ডরমিটরিতেই থাকো। খোঁজ-খবর করে দেখো নতুন কোন তথ্য বের করতে পারো কিনা। আমি আর রবিন চিড়িয়াখানায় যাচ্ছি। ডক্টর হেমিঙের সঙ্গে আরেকবার কথা বলতে হবে। তাঁর সহকারী ড্যানি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে।'

গাড়িতে ফিরে ড্রাইভিং সীটে বসল রবিন। এখন তার পাশে বসল কিশোর। সেলুলার ফোনে কথা শুনতে লাগল। ওয়ালথ্রপদের ফোন মেশিন ট্যাপ করে এসেছিল। কয়েক মিনিট পর রবিনকে জানাল, 'নিকের জন্যে একটা মেসেজ রেখে গেছে রায়না। আজ বিকেল ছয়টায় হ্যাংম্যান নামে একটা জায়গায় দেখা করতে বলেছে।' এক মুহূর্ত থামল সে। 'ওই সময়ের মধ্যে যদি কেসটার সমাধান করতে না পারি, ওয়ালথ্রপদের পিছু নেব আবার। এখন আরেকটু জোরে চালানোর চেষ্টা করো। হাতে সময় বড় কম।'

# বারো

তিরিশ মিনিট পর। চিড়িয়াখানার ভেতরে দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে দুই গোয়েন্দা। কালো মেঘগুলো এখন শহরের আকাশ থেকে বেরিয়ে গেছে, রেখে গেছে বাতাসে প্রচুর আর্দ্রতা আর আগস্টের অসহ্য আঠা আঠা গরম। যাঁকে খুঁজছিল, কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা পাওয়া গেল তাঁর।

আগে দেখতে পেল রবিন। হাত তুলে বলল, 'দেখো।'

ক্যাঙারুর ঘেরের কাছাকাছি ড্যানির সঙ্গে তপ্ত স্বরে কথা বলছেন ডক্টর হেমিং।

'আড়ি পাতা যাক,' বলে হালকা ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল কিশোর।

সঙ্গে চলল রবিন।

জায়গাটা সমতল। ঘাসে ঢাকা। অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমির অনুকরণে সাজানো। ক্যাঙারু দেখার ভান করতে লাগল দুজনে। কান খাড়া রেখেছে কথা শোনার জন্যে।

'ভিডিও টেপটা আমার করা,' ড্যানি বলছে। 'আপনার রাখার কোন অধিকার নেই।'

'কিন্তু ভিডিও করার সময় আমার আন্ডারে ছিলে তুমি,' ডক্টর হেমিং বললেন। 'তোমাকে তো বললামই একটা কপি করে তোমাকে দেব।'

'আমি কপি চাই না! আমার আসলটাই দরকার। দেখুন, ডক্টর, গবেষণাটা আমি করেছি, জিনিসটা আমার কাছেই থাকা উচিত। আমি বরং আপনাকে একটা কপি দিতে পারি। আসলটা থাকলে বিজ্ঞানী হিসেবে ভবিষ্যতে আমার কাজে লাগবে, আমার ক্যারিয়ারের জন্যে জরুরী।'

'নাহ্, তোমাকে বোঝানোর সাধ্য আমার নেই!' হাল ছেড়ে দিলেন ডক্টর হেমিং। 'থাকগে, তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও। রিসার্চ রুমে ফাইলিং কেবিনেটের পেছনে রেখেছি। নিয়ে নাওগে।'

দুই পায়ে ভর করে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসতে লাগল একটা ক্যাঙারু।

ক্যাঙারুটাকে অনুসরণ করে নজর ঘুরতেই দুই গোয়েন্দার ওপর চোখ পড়ল ড্যানির।

'হাই, ড্যানি,' কিশোরের ভঙ্গি দেখে মনে হলো এইমাত্র দেখল ড্যানিকে। 'কি একেকখান লাফ দেয় ক্যাঙারুরা, দেখেছেন! ওরিব্বাপরে!'

'হ্যাঁ,' নীরস কণ্ঠে জবাব দিল ড্যানি। 'মারসুপিয়ালদের নিয়ে আলোচনার সময় নেই আমার এখন। চলি। জরুরী কাজ আছে।' লম্বা লম্বা পা ফেলে সরে যেতে লাগল ঘেরের কাছ থেকে।

'ড্যানি, শুনুন,' ডাক দিল কিশোর।

'এই, শোনো, দাঁড়াও,' জ্বলন্ত চোখে দুই গোয়েন্দার দিকে তাকালেন ডক্টর হেমিং। 'আমি সব শুনেছি। চিড়িয়াখানার বন্ধু নও তোমরা, গোয়েন্দা, ড্যানি বলেছে আমাকে। কাল রাতে নাকি সারা চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়িয়েছ। ওর সন্দেহ, আমার ল্যাবরেটরিতে চুরি করে তোমরাই ঢুকেছিলে। ঢুকেছ যে কি করে বুঝলাম? কাগজপত্র সব অগোছাল। বোম্যানকে বলব, ঘাড় ধরে যেন বের করে দেয় তোমাদের। কোনমতেই আর ঢুকতে না পারো।'

'গেল!' বিড়বিড় করল রবিন।

পরিচয় যখন ফাঁসই হয়ে গেছে ডক্টর হেমিঙের কাছে, ঢাকঢাকের মধ্যে আর গেল না কিশোর, জিজ্ঞেস করল, 'কি আছে ভিডিও টেপটার মধ্যে, যেটা নিয়ে তর্কাতর্কি করছিলেন এতক্ষণ?'

'সেটা তোমার ব্যাপার নয়!' ধমকে উঠলেন ডক্টর হেমিং। 'ভালয় ভালয় চলে যাও, নইলে দেব শিম্পাঞ্জিগুলোকে লেলিয়ে।'

'কাল রাতে যা করেছিলেন,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রবিন।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ডক্টর হেমিঙের। 'কি বলছ? কাল রাতে চিড়িয়াখানায় ছিলামই না আমি। বাড়িতে ছিলাম।'

স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। সত্যি বলছেন কিনা বুঝতে চাইছে। মনে হলো, সত্যিই বলছেন। তার সন্দেহটা যাচাই করে নেয়ার জন্যে বলল, 'ডক্টর হেমিং, আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, ববি, টপ আর বেবি জুপিটারকে ব্যবহার করছে ড্যানি, চিড়িয়াখানায় স্যাবটাজ করানোর কাজে। দয়া করে যদি বলেন, যে ভিডিও টেপটা পাওয়ার জন্যে সে মরিয়া হয়ে উঠেছে, ওটাতে কি আছে, অনেক উপকার হবে।'

দ্বিধা করতে লাগলেন ডক্টর হেমিং। বলবেন কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না যেন। 'আমার শিম্পাঞ্জি দিয়ে স্যাবটাজ করিয়েছে?' ভুরু কুঁচকালেন তিনি। 'ড্যানি আমার সহকারী হিসেবে কাজ করেছে। সে দেখতে চেয়েছিল মানুষের মত টুলস ব্যবহার করতে পারে নাকি শিম্পাঞ্জিরা। অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ফলাফল। ভিডিও টেপে রেকর্ড করে রেখেছে দৃশ্যগুলো।'

চট করে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ডক্টর হেমিং। 'কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। টেপটা রেখে দিয়েছিলাম। কাল এসে আমার কাছে ওটা চাইল সে। দেব না, মানা করে দিয়ে লুকিয়ে ফেললাম। কিন্তু ওর চাপাচাপিতে

বিরক্ত হয়ে একটু আগে বলে দিয়েছি কোথায় আছে।'

'টেপটা পাওয়ার জন্যে কেন অস্থির হয়ে উঠেছে, বোধহয় বুঝতে পারছি,' রবিন বলল। 'স্যাবটাজগুলো কিভাবে করা হয়েছে, ভিডিও টেপের ছবি সেটা প্রমাণ করতে সাহায্য করবে। শিম্পাঞ্জিগুলোকে সে কি শিখিয়েছে, সেটা দেখলে পুলিশের কোন সন্দেহ থাকবে না আর।'

'ঠিক,' বলে উঠল কিশোর, 'আর সেজন্যেই আসল ক্যাসেটটা হাতে পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে, যাতে ধ্বংস করে ফেলে সব প্রমাণ নষ্ট করে দিতে পারে। জলদি এসো!'

ল্যাবরেটরির দিকে দৌড় দিল সে। দরজা খোলা। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। হলঘরটা খালি। নিজেদের খোঁয়াড়ে বসে গভীর মনোযোগে কাঠের একটা খেলনা ঘর বানাচ্ছে শিম্পাঞ্জিগুলো।

'গেল কোথায়?' এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে অফিসের দিকে এগিয়ে গেল রবিন। উঁকি দিল ভেতরে।

কিশোরও এসে দাঁড়াল তার পাশে। ফাইলিং কেবিনেটটা দেয়ালের কাছ থেকে সরানো। একটা পাশ অনেক বেশি ফাঁক হয়ে আছে। 'নিয়ে গেছে টেপটা!'

'নষ্ট করে ফেলার আগেই ওকে খুঁজে বের করতে হবে,' জরুরী কণ্ঠে বলল রবিন। 'প্রমাণ না থাকলে আর ওকে আটকানো যাবে না।'

ওদের নজর আকর্ষণের জন্যে 'উফ্-উফ্' শুরু করল ববি। ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল উৎসুক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে শিম্পাঞ্জিটা।

'ড্যানি হাওয়ার্ড কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। আশা করল, বুঝতে পারবে ববি।

শিকের ফাঁক দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল ববি, একেবারে মানুষের মত করে। দেখাদেখি তার পাশে ছুটে এসে একই কাণ্ড করল টপ আর রেবি জুপিটার।

'টাকা চাইছে ওরা!' চিৎকার করে উঠল রবিন। বিশ্বাস করতে পারছে না। 'ঘুষ না দিলে বলবে না!'

নষ্ট করার সময় নেই। ওয়ালেট খুলে তিনটা এক ডলারের নোট বের করে শিম্পাঞ্জিগুলোর বাড়ানো হাতের তালুতে ফেলে দিল কিশোর। টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে ঘরের অন্য প্রান্তের একটা খোলা জানালা দেখাতে লাগল ওগুলো।

জানালার কাছে ছুটে গেল রবিন। ড্যানিকে দৌড়ে যেতে দেখল। অনেক দূরে চলে গেছে।

'ওই যে! পালাচ্ছে!' এক মুহূর্ত দেরি না করে জানালার চৌকাঠে উঠে বসল রবিন। লাফ দিয়ে নেমে গেল বাইরে।

স্প্রিঙের পুতুলের মত লাফাতে শুরু করল শিম্পাঞ্জিগুলো। চিৎকার করছে। জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে। যেন উত্তেজনায় ভরা কোন টিভি শো দেখছে।

'তোমাদের তুলনা হয় না,' শিম্পাঞ্জিগুলোর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল কিশোর। 'থ্যাংক ইউ।'

রবিনের মত করেই জানালা টপকাল। ড্যানিকে ধরার জন্যে পিছু নিল রবিনের। প্রাণপণে ছুটছে দুজনে। দূরত্ব কমিয়ে ফেলছে দ্রুত। ড্যানির হাতের ক্যাসেটটা

এখন দেখতে পাচ্ছে। কি ভেবে ফিরে তাকাল ড্যানি। দুই গোয়েন্দাকে দেখে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে আরেক দিকে ঘুরে গেল সে। যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে না গিয়ে এক ছুটে ঢুকে পড়ল 'বারাম্বি'তে। বারাম্বি হলো আফ্রিকার অনুকরণে তৈরি ওখানকার এক ধরনের গ্রাম। দুই গোয়েন্দাও এসে ঢুকল ওই নকল গ্রামে। মাটির দেয়ালওয়ালা এক গুচ্ছ কুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে, শনের চালা। ঢাক বাজছে গোপন স্পীকারে। একটা কুঁড়ের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে কিছু দর্শক। ফাস্ট-ফুড বিক্রি হচ্ছে ওখানে।

দৌড়ে গিয়ে গিয়ে প্রতিটি ঘরে ঢুকে দেখে এল রবিন আর কিশোর। ড্যানিকে দেখল না।

'গেল কোথায়?' কান ঝালাপালা করা ঢাকের শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল রবিন।

'ওই তো!' কিশোরও চিৎকার করে উঠল।

ওর নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে রবিনও দেখল, মনোরেলে চড়ার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো এক সারি দর্শককে ঠেলে-ধাক্কিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ড্যানি।

দুই গোয়েন্দা যখন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছল, ড্যানি তখন মনোরেল ট্রেনের একটা অ্যাকোয়া কার থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামাচ্ছে কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে।

'সাফারিতে যাওয়ার যাত্রীরা গাড়িতে উঠুন,' লাউডস্পীকার মুখে ঠেকিয়ে ঘোষণা করল ট্রেনের ড্রাইভার।

লাফিয়ে কারে উঠে পড়ল ড্যানি। ক্যাসেটটা এখনও ওর হাতে রয়েছে, নজর এড়াল না রবিনের।

চলতে শুরু করল মনোরেল।

ড্যানি যেটাতে উঠেছে তাতে উঠতে দেবে না, বুঝতে পারছে রবিন। তার পেছনের কারে দেখল শুধু দুজন বুড়ো-বুড়ি বসে আছে। একলাফে উঠে পড়ল ওটার পা-দানিতে। ভেতরে ঢুকে বসল। অবাক চোখে ওকে দেখতে লাগল বৃদ্ধ যাত্রীরা।

'এই সাফারি আমাদের সাভানার ওপর দিয়ে নিয়ে যাবে,' বলে চলেছে ড্রাইভার। 'আফ্রিকার সীমাহীন তৃণপ্রান্তরকে বলে সাভানা। আফ্রিকায় বুনো জানোয়ার দেখার জন্যে সাভানার চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।'

লাইন বেয়ে ছুটে চলেছে মনোরেল। কারের কিনার দিয়ে ঝুঁকে তাকাল রবিন। পরের কারে দেখতে পেল ড্যানিকে। একলা বসে আছে। ক্যাসেট থেকে ফিতেটা টেনে বের করার চেষ্টা করছে।

'ড্যানি, প্লীজ, নষ্ট করবেন না ওটা!' চিৎকার করে বলল সে।

'এটা আমার জিনিস,' চিৎকার করেই জবাব দিল ড্যানি। 'আমার জিনিস আমি কি করব না করব, সেটা আমার ব্যাপার।'

'নিচের দিকে তাকিয়ে দেখুন,' ড্রাইভার বলছে, 'জেব্রার পাল চরতে দেখবেন।'

নিচে তাকাল রবিন। ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকটা ছাতার মত গাছ। ছুটে চলেছে একপাল জেব্রা। সাদা-কালো ডোরা কাটা শরীরগুলো রোদে

চমকাচ্ছে।

'অসম্ভব দ্রুত ছুটতে পারে জেব্রারা,' ড্রাইভার বলল। 'শিকারী প্রাণী তাড়া করলে দৌড়ে পালাতে সুবিধে হয় ওদের।'

পরের কারের দিকে তাকাল আবার রবিন। ক্যাসেটের ফিতে বের করার চেষ্টা করছে ড্যানি। সবটা বের করে ফেলার আগেই কেড়ে নিতে হবে।

'আই, বসে পড়ো,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল বৃদ্ধা।

'আমি চলে যাচ্ছি ওই কারে,' নরম স্বরে জবাব দিল রবিন।

আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে দেখল বৃদ্ধা, ফাইবার গ্লাসে তৈরি স্ট্রিপ–যেটা দুটো কারকে যুক্ত করে রেখেছে, অবলীলায় তাতে নেমে গেল ছেলেটা। দুটো কারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এখন সে।

'পাগল নাকি!' চিৎকার করে উঠল ড্যানি।

'প্লীজ, নষ্ট করবেন না ক্যাসেটটা!' অনুরোধ জানাল রবিন।

'নষ্ট আমি করবই।'

'জেব্রার সবচেয়ে ভয়াবহ শত্রুর এলাকা দিয়ে চলেছি আমরা এখন,' ড্রাইভার বলল। 'নিচে তাকালেই দেখতে পাবেন সিংহের পরিবার।'

হাত বাড়িয়ে ড্যানির কারের ছাতের কিনারটা ধরে ফেলল রবিন। এক দোলা দিয়ে শরীরটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল কারের দিকে।

'ভাগো এখান থেকে!' উঠে দাঁড়িয়েছে ড্যানি।

জবাবে কারের মধ্যে একটা পা ঢুকিয়ে দিল রবিন।

'ভাগো, ভাল হবে না বলছি!' আবার চিৎকার করে উঠল ড্যানি। রবিনের পেটে ঠেলা মারল। একটা হাত ফসকে গেল রবিনের। পড়ে যাচ্ছে।

মরিয়া হয়ে বাতাসে থাবা মারল রবিন। আঙুল ঠেকল কিসের কিনারে, ঠিক বুঝতে পারল না। ঝুলে রয়েছে। তার মনে হচ্ছে, ট্রেনটা থেমে রয়েছে, নিচে দিয়ে চলে যাচ্ছে আফ্রিকার তৃণভূমি।

'পড়ে যাচ্ছে! পড়ে যাচ্ছে!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল একজন যাত্রী।

'গাড়ি থামান! জলদি!' চেঁচিয়ে উঠল আরেকজন।

নিচে তাকাল রবিন। দোতলা-সমান উঁচুতে রয়েছে। পড়লে হাত-পা ভাঙার সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু যা করার করে ফেলেছে। এখন বাঁচতে হলে আঁকড়ে ধরে রাখা ছাড়া উপায় নেই।

নিচে পড়ার আরও বিপদ আছে। সিংহগুলো তাকিয়ে রয়েছে ঠিক ওর দিকে। কয়েকটা চকচকে সিংহী, আর বিশালদেহী কেশরওয়ালা এক সিংহ। ওর চওড়া নাক, স্থির হলুদ দৃষ্টি, রাজকীয় কেশর থেকে আভিজাত্য যেন ফুটে বেরোচ্ছে। নিচের ওই প্রান্তরের কর্তৃত্ব ওর; কোন সন্দেহ নেই। ওর মুখের কাছে পড়লে, কি ঘটবে ভাবতে চাইল না রবিন।

চাকা ঘষার শব্দ হলো। ব্রেক চেপেছে ড্রাইভার। ঝাঁকি লেগে আঙুলগুলো ছুটে যাচ্ছে রবিনের। হাতের তালু ঘামে ভেজা, পিচ্ছিল। ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

ধমক দিয়ে তাকে ফেলে দেয়ার জন্যেই যেন এই সময় বিকট গর্জন করে

উঠল সিংহটা। মুখ হাঁ করে দেখিয়ে দিল ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে রবিনের দিকে।

# তেরো

মুখ তুলে ড্যানিকে কার থেকে মাথা বের করে রাখতে দেখল রবিন। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, 'আমাকে ধরুন, ড্যানি! আঙুল পিছলে যাচ্ছে!'

নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ড্যানি।

বললেই বা কেন আমাকে সাহায্য করবে সে—ভাবছে রবিন। আমি ওকে জেলে ঢোকানোর ব্যবস্থা করতে চাইছি। কারের বাইরে মাথা বের করে অনেকেই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কিন্তু সাহায্য করা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে, অনেক দূরে রয়েছে।

নিচে তাকিয়ে দেখল ধৈর্য ধরে তার অপেক্ষা করছে সিংহটা। যেন ভাবছে, পড়বেই তো, অস্থির হওয়ার কোন কারণ নেই। ধারাল দাঁত নিজের মাংসে বসে যাওয়ার ব্যথাটাও যেন অনুভব করতে পারল রবিন।

আরেকটু পিছলে গেল তার ঘামে ভেজা পিচ্ছিল আঙুল।

'আর কিছু না হোক,' ড্যানির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল রবিন, 'আর কিছু না হোক, এটা অন্তত প্রমাণ করুন যে আপনি খুনী নন।'

'ধরছেন না কেন ছেলেটাকে?' চিৎকার করে বলল একজন লোক। 'পড়ে যাচ্ছে তো! জলদি ধরুন!'

কয়েকটা দীর্ঘ সেকেন্ড পার হয়ে গেল।

অবশেষে ঝুঁকে এসে হাত বাড়িয়ে দিল ড্যানি। রবিনের কব্জি চেপে ধরল। টেনে তুলল ওকে।

কারের মধ্যে পা রাখল রবিন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

'যাক, বাঁচল!' বলল অন্য কারের একটা লোক। আনন্দে হুল্লোড় করে উঠল যারা তাকিয়ে দেখছিল এতক্ষণ। হাততালি শোনা গেল। আবার চলতে শুরু করল মনোরেল।

ড্যানির দিকে তাকাল রবিন। হাতের কাছে ফেলে রেখেছে ক্যাসেটটা।

'প্রথমেই আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ জানাই আপনাকে,' রবিন বলল।

অন্য দিকে চোখ ফেরাল ড্যানি।

'ওই জানোয়ারগুলোকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে আপনিই দায়ী, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

নার্ভাস ভঙ্গিতে ক্যাসেটটার গায়ে টোকা দিতে লাগল ড্যানি। মাত্র কয়েক ইঞ্চি ফিতা বেরিয়ে আছে। তাতে নষ্ট হয়নি ক্যাসেট।

'আমরা এখন একপাল অরিক্সের ওপর দিয়ে পেরোচ্ছি,' ঘোষণা করল ড্রাইভারের যান্ত্রিক কণ্ঠ। 'অ্যান্টিলোপ পরিবারের সদস্য এরা। এরাও সিংহের

খাবার।'

'চমৎকার ভাবে ঘটিয়েছেন স্যাবটাজের ঘটনাগুলো,' রবিন বলল আবার। 'ভিডিও টেপটা ছাড়া কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। তবে লোকে যখন ভাবতে আরম্ভ করবে চিড়িয়াখানায় আসা বিপজ্জনক, আসা কমিয়ে দেবে ওরা। টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবে চিড়িয়াখানার। উপার্জন কমে যাবে।'

মুখ ফেরাল ড্যানি। চোখে চোখে তাকানোর সুযোগ পেল রবিন। 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা মনোমালিন্য হয়েছে আপনার, জানি; কিন্তু এটাও জানি জন্তু-জানোয়ারগুলোর জন্যে অপরিসীম ভালবাসা আপনার। ওদের স্বার্থে অন্তত মুখ খুলুন।'

ড্যানির নিচের ঠোঁট কেঁপে উঠল।

'শুনুন,' রবিন বলল, 'কয়েক মিনিট আগেই আমাকে তুলে এনে আপনি প্রমাণ করে দিয়েছেন অতটা খারাপ লোক নন আপনি। প্লীজ, বলুন, স্যাবটাজগুলো কি আপনিই করেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' বলার সময় চোখ বুজে ফেলল ড্যানি।

'রাজকুমারী আর চিতাটাকে কি আপনিই কিডন্যাপ করেছেন?'

'রাজকুমারী?' চন্দ্রাবতীর নিরুদ্দেশের কথা শুনে চমকে গেল ড্যানি। 'কিডন্যাপড হয়েছে নাকি? কই, জানি না তো!'

'বেশ, স্যাবটাজগুলো কেন করলেন, সেটাই বলুন।'

সামান্য দ্বিধা করে বলতে শুরু করল ড্যানি, 'জুলুজিতে ডিগ্রি নেয়ার পর শিম্পাঞ্জির ওপর গবেষণা করে ক্যারিয়ার শুরু করব ঠিক করলাম। ডক্টর হেমিঙের সহকারী হিসেবে কাজ করার সুযোগটা যখন পেলাম, রীতিমত পুলকিত হয়েছিলাম। এ সব কাজ সচরাচর পাওয়া যায় না। আনন্দে আরও ভরে গেল মন যখন জানলাম, তানজানিয়ায় শিম্পাঞ্জির ওপর ফীল্ড রিসার্চ করতে যাচ্ছেন তিনি। আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হয়েছিল।'

'তারপর কর্তৃপক্ষ দিল আপনাদের ফান্ডটা মেরে,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' চশমাটা খুলে নিল ড্যানি। 'হঠাৎ করেই ডক্টর হেমিঙের যাওয়া বাতিল। তার ওপর বিদেয় করতে হবো আমাকে। আফ্রিকায় যাওয়া তো হলোই না আমার, চাকরিও খতম। দয়া করে চিড়িয়াখানায় থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন বোম্যান, নাইট গার্ডের চাকরি দিয়ে। কিন্তু ও কি আমার পোষায়। মগজে আগুন জ্বলতে লাগল।'

'প্রতিশোধ নিতে চাইলেন আপনি,' কথা জুগিয়ে দিল রবিন।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করতে আর দ্বিধা করল না ড্যানি। 'ভেবেচিন্তে একটা প্ল্যান করলাম; এক ঢিলে দুই পাখি মারার চিন্তা। প্রতিশোধও নেয়া হবে, শিম্পাঞ্জিগুলোর ওপর একটা মূল্যবান গবেষণাও চালানো যাবে।'

'টুলস ব্যবহার শেখালেন আপনি শিম্পাঞ্জিগুলোকে,' রবিন বলল। 'রাতের বেলা বের করে নিয়ে গেলেন। ওদের দিয়ে হট-ওয়্যার কাটালেন, ভেন্টের স্ক্রু খোলালেন, গাছের ডাল কাটালেন।'

'আমার গবেষণারই অঙ্গ ছিল এ সব। তবে চিড়িয়াখানার জন্যে ক্ষতির কারণ

হয়েছে বলে সেটা অপরাধের আওতায় পড়ে। শিম্পাঞ্জিরা ওসব করার সময় ছবি তুলে রেখেছিলাম। ভিডিও টেপটা নষ্ট করে ফেললে সব প্রমাণ শেষ হয়ে যেত, কিন্তু তাতে মূল্যবান দলিল নষ্ট হত, চেষ্টা করেও পারলাম না তাই,' শুকনো হাসি হাসল ড্যানি।

দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি চেপে ধরল রবিন। মনে মনে স্বীকার না করে পারল না, ড্যানির গবেষণার বিষয়বস্তু সত্যি অসাধারণ; কিন্তু চিড়িয়াখানাকে এ ভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়াটা ছিল একটা বিপজ্জনক বোকামি।

'আমি শুধু চিড়িয়াখানাটার বদনাম করে দিতে চেয়েছিলাম,' কথা শুরু করার পর যেন কথার নেশায় পেয়েছে ড্যানিকে। 'কিন্তু বিশ্বাস করো, কারও কোন ক্ষতি হয়ে যাক, কেউ আহত হোক, এটা চাইনি। আমি জানতাম, চিড়িয়াখানার স্টাফরা খুব দক্ষ, বেরিয়ে যাওয়া প্রাণীগুলোকে খুব দ্রুত ধরে ফেলবে। বানর আর পাইথন মোটেও বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর নয়, আর বাঘকে না খোঁচালে মানুষের কোন ক্ষতি করে না।'

'এইবার আসছে জিরাফ,' লাউডস্পীকারে ঘোষণা করল ড্রাইভার। 'ডাঙার সবচেয়ে লম্বা জানোয়ার।'

নিচের তৃণভূমিতে দুটো জিরাফকে হেঁটে যেতে দেখল রবিন। ড্যানির দিকে তাকাল আবার, 'আপনিই রাতের বেলা শিম্পাঞ্জিগুলোকে আমাদের ওপর লেলিয়ে দিয়েছিলেন।'

'আমি বুঝতে পেরেছিলাম, চিড়িয়াখানায় সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছ তোমরা,' ড্যানি বলল। 'তারপর মনে পড়ল, ডক্টর হেমিঙের অফিসে ভিডিও টেপটা আছে। ওটা তোমাদের হাতে পড়লে বিপদে পড়ে যাব আমি। তাই গতরাতে তোমাদের চিড়িয়াখানায় ঘোরানো শেষ করে চলে গিয়েছিলাম ওটা আনতে।'

'কিন্তু আপনি ওটা বের করার আগেই ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়লাম আমরা,' ড্যানির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন। 'শিম্পাঞ্জিগুলোকে কাঠ কাটাতে দেখে ঘাবড়ে গেলেন; বুঝলেন, আপনাকে সন্দেহ করে বসব আমরা। আমাদের ঠেকানোর জন্যে দিলেন খোঁয়াড়ের তালা খুলে। ওরা আমাদের মারাত্মক জখম করতে পারত, মেরেও ফেলতে পারত...'

'তোমাদের আসলে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চেয়েছিলাম আমি,' কৈফিয়তের সুরে বলল ড্যানি। 'অফিসেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, বাই চান্স যদি খারাপ কিছু ঘটে যায়, তোমাদের সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু তোমরা অনেক চালাক...'

বাধা দিল রবিন, 'রাতেই ক্যাসেটটা বের করে নিলেন না কেন?'

'খুঁজে পাইনি। লুকিয়ে রেখেছিলেন ডক্টর হেমিং। আজকে তিনি বলার পর গিয়ে বের করেছি। যাই হোক...রবিন, সত্যি কথাটা বলি, আমাকে যে ধরে ফেলেছ তোমরা তাতে আমি অখুশি নই। এখন যা হয় হোক। অপরাধী মন নিয়ে চিড়িয়াখানায় কাজ চালিয়ে যেতে পারতাম না এমনিতেও।' ভিড়িও ক্যাসেটটা রবিনকে দিয়ে দিল সে। 'নাও, তোমার কাছে গচ্ছিত রাখলাম। নষ্ট যেন না হয়।'

'এখন ঢুকছি আমরা হায়েনার রাজত্বে,' লাউডস্পীকারে ঘোষিত হলো। 'এরপর আর কিছু নেই। ঘাঁটিতে ফিরব আমরা। আশা করি এই সাফারি খুব উপভোগ

করেছেন আপনারা। ধন্যবাদ।'

কয়েক মিনিট পর প্ল্যাটফর্মে ফিরে এল মনোরেল। খুলে গেল স্বয়ংক্রিয় দরজাগুলো। সারি দিয়ে দাঁড়ানো কয়েকজন পুলিশের পেছনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কৌতূহলী দর্শকেরা। দরজা খুলতেই রবিনদের কারের দিকে এগিয়ে এল চারজন পুলিশ।

ড্যানির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল একজন অফিসার, 'অ্যারেস্ট করা হলো আপনাকে।'

রবিন নামতেই দৌড়ে এল কিশোর আর বোম্যান।

জিজ্ঞেস করল উদ্বিগ্ন কিশোর, 'তুমি ভাল আছ?'

হাসল রবিন, 'আছি। ড্যানি না বাঁচালে এতক্ষণে সিংহের পেটে চলে যেতাম।'

ড্যানির মুখে যা যা শুনেছে, খুলে বলল রবিন। শুনল কিশোর, বোম্যান আর একজন পুলিশ অফিসার। ক্যাসেটটা অফিসারকে দিয়ে বলল, দেখার পর যে অবস্থায় আছে সে-অবস্থায়ই আবার ফিরিয়ে দিতে, কোন ক্ষতি যেন না হয়। জোরের সঙ্গে জানিয়ে রাখল, ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে ড্যানি। কাজেই বিচারের সময় সেটা বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে।

দর্শকদের মাঝখান দিয়ে পথ করে ড্যানিকে নিয়ে চলে গেল পুলিশ। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন বোম্যান, 'আজকে তোমাদের একটা কাজ দেখেই বোঝা গেল, সুখ্যাতিটা অর্জন করতে তিন গোয়েন্দাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।'

'কিন্তু কেসটা এখনও শেষ হয়নি, মিস্টার বোম্যান,' কিশোর বলল। 'কান্তা আর রাজকুমারীকে এখনও উদ্ধার করতে পারিনি আমরা।'

'ড্যানি কিছু জানে না, আমি শিওর,' রবিন বলল। 'ও শুধু চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কিডন্যাপিংটা ভিন্ন কেস, অন্য কারও কাজ।'

'চলো, হ্যাংম্যানে গিয়ে ওয়ালথ্রপদের ওপর নজর রাখি।' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'ছয়টা বাজতে এখনও দেরি আছে। তবে আগেভাগে গিয়ে বসে থাকাই ভাল।'

'তোমাদের সাহায্য দরকার হবে?' জিজ্ঞেস করলেন বোম্যান।

'এখনও মনে হচ্ছে না। চলো, রবিন।'

বোম্যানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রওনা হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

'তোমার কি মনে হচ্ছে,' হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন, 'চন্দ্রাবতীর সঙ্গে কান্তার কিডন্যাপিঙের কোন সম্পর্ক আছে?'

'থাকাটাই স্বাভাবিক,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে সেটা কি এখনও বুঝতে পারছি না।'

হাতির ঘেরের কাছে চলে এল দুজনে। গিনিকে দেখল শুঁড় দিয়ে তুলে তুলে ঘাস খাচ্ছে। একটা বাচ্চা হাতি খেলতে খেলতে ছুটে গিয়ে মাথা দিয়ে ওটার পেটে গুঁতো মারতে শুরু করল।

শুঁড় দিয়ে এক মুঠো ঘাস তুলে বাচ্চাটার দিকে বাড়িয়ে দিল গিনি। বাচ্চাটা ঘাস

মুখে নিয়ে চিবানো শুরু করতেই বিদ্যুৎ ঝলকের মত বুদ্ধিটা মাথায় এসে গেল কিশোরের।

রবিনের পাঁজরে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল সে, 'রবিন, দেখো, কি করে হাতিটা বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছে।'

'হ্যাঁ, দেখছি। মায়েরা এ ভাবেই খাওয়ায়।'

'চন্দ্রাবতীও কান্তার কাছে মায়ের মত। চিতাটার পর পরই রাজকুমারীকে কিডন্যাপিঙের কারণটা বুঝে ফেলেছি। কান্তাকে নেয়ার পর কিডন্যাপার যখন দেখল ওকে খাওয়াতে পারছে না, চন্দ্রাবতীকে তুলে নিয়ে গেছে তখন।'

'ঠিক!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। 'চন্দ্রাবতীর কাপড়ের টুকরো ফেলে গন্ধ না শোঁকানো পর্যন্ত চিড়িয়াখানার লোকেরাই খাওয়াতে পারেনি চিতাটাকে, চোরে আর কি করে খাওয়াবে। ঠিক বলেছ। কান্তাকে নেয়ার পর রাজকুমারীকে কিডন্যাপ করেছে এ জন্যেই।'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

মুসাকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কোন্ একটা পাগল নাকি মনোরেল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল?...তোমাদের মধ্যে কোনজন?'

'রবিন,' হেসে বলল কিশোর। 'তোমার কি খবর? তুমি আবার কোন পাগলামি করে এলে?'

'শুধু শুধু বসে থাকতে তো ভাল্লাগল না,' মুসা বলল। 'সারা ক্যাম্পাসে প্রশ্ন করে বেড়াতে লাগলাম। ভানুস্বামী খুব ভাল স্বামী হওয়ার উপযুক্ত। কোন বদনেশা নেই, দোষের কাজ করে না, ক্লাসে ফাঁকি দেয় না। আমেরিকানদের দুচোখে দেখতে পারে না। সারাক্ষণ মন খারাপ করে থাকে।'

'ভাবীবধূ কথা না শুনলে মন তো খারাপ হবেই,' হাসল রবিন। 'ও-ই চুরি করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখেনি তো?'

'মনে হয় না,' আবার ঘড়ি দেখল কিশোর। 'রবিন, একদিনে অনেক পরিশ্রম করেছ তুমি, আর অ্যাকশনে গিয়ে কাজ নেই। আমি মুসাকে নিয়ে ওয়ালথ্রপদের দেখতে যাচ্ছি। তুমি বাড়ি চলে যাও। কান্‌ঝায় চন্দ্রাবতীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করোগে ফোনে। পুলিশের কাছে শুনলাম, কিডন্যাপিঙের খবরটা চন্দ্রাবতীর পরিবারকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ভানুর ব্যাপারে কোন নতুন তথ্য পাওয়া যায় কিনা দেখো।'

'ঠিক আছে দেখব,' রবিন বলল। 'ভাল কথা, ডক্টর হেমিংকে তো এখন আর কোন অপরাধের সঙ্গে জড়ানো যাচ্ছে না। ড্যানি তো স্বীকারই করেছে, স্যাবটাজগুলোর জন্যে দায়ী সে একা। তাহলে ডক্টর হেমিং?'

'তিনি আপাতত সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ,' মুসা বলল। 'প্রধান সন্দেহ এখন দুই ওয়ালথ্রপকে।'

'কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করছে আমার,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'কোথায় যেন কি একটা মিস হয়ে গেছে। আমরা জানি, অথচ জানি না।'

'ব্যস, শুরু হলো গ্রীক ভাষা!' আঁতকে ওঠার ভান করল মুসা। 'চলো চলো, যে

কাজে যেতে চাইছিলে, সেটাই করিগে।'

হাঁটতে হাঁটতে ভালুকের ঘেরের কাছে চলে এল ওরা। চোখ ঝলসানো সাদা কৃত্রিম তুষার তৈরি করা হয়েছে। সাদার পটভূমিতে দুটো সাদা মেরুভালুককে খুঁজে বের করতে চোখ দুটোকে বহু কসরত করাতে হলো রবিনের। ভালুক দুটোর কালো নাক বেইমানী করল ওদের সঙ্গে, অস্তিত্ব ফাঁস করে দিল।

হেলেদুলে গিয়ে একটা প্লাস্টিকের বালতির কাছে দাঁড়াল একটা ভালুক। থাবা দিয়ে ঠেলা মারতে লাগল খেলার ছলে।

'মোটেও ভয়ঙ্কর লাগছে না ওকে,' রবিন মন্তব্য করল।

'ভুলেও কাছে যেয়ো না ওর,' সাবধান করে দিল মুসা। 'সারা চিড়িয়াখানায় সবচেয়ে হিংস্র ওই মেরুভালুক। খেলতে খেলতে তোমাকে মেরে ফেলবে ও। এক থাবা খেলেই তোমার মুখ আর মুখ থাকবে না, চিরে ফালা ফালা।'

'কিন্তু খুব সুন্দর।'

'চেহারা দেখে সব সময় আসল চরিত্র বোঝা যায় না। অনেক মানুষের মত।'

তার কথা প্রমাণ করে দেয়ার জন্যেই বালতিটাকে ভয়ানক এক থাপ্পড় মারল ভালুকটা।

ওই থাবা নিজের মুখে পড়লে কি ঘটত, কল্পনা করে আর ভালুকের খাঁচার কাছে দাঁড়াতে চাইল না মুসা। তাগাদা দিল কিশোরকে, 'চলো, এখানে সময় নষ্ট না করে আসল কাজে যাই।'

## চোদ্দ

সাড়ে পাঁচটায় মুসার গাড়িতে করে হ্যাংওয়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছল মুসা আর কিশোর। শহরের বাইরে এই এলাকাটাতে মাংস টিনজাত করার কারখানা। বাতাসে এক ধরনের বোটকা গন্ধ। এলাকাটা মোটামুটি নির্জন। প্রচুর ট্রাক দেখা যাচ্ছে বড় বড় বাড়িগুলোর সামনে। ওই বাড়িগুলো মাংস টিনজাত করার কারখানা।

'ওই যে ওটা!' একটা বাড়ির দিকে হাত তুলল কিশোর। দরজায় নাম লেখা বোর্ড লাগানো রয়েছে : হ্যাংওয়ে। কিছুদূরে গাড়ি রেখে বাড়ির দিকে তাকিয়ে বসে রইল ওরা।

বেরিংটনকে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল। দুই হাতে কার্ডবোর্ডের দুটো বড় বড় বাক্স। যথেষ্ট ভারী, পেটের সঙ্গে চেপে ধরার ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে। হাঁটার তালে তালে সিংহের কেশরের মত নাচছে তাঁর ঘাড়ের লম্বা সাদা চুলের বোঝা।

'শিকারী কোটিপতি এখানে কি করছেন?' মুসার প্রশ্ন।

'মাংস কিনতে এসেছেন হয়তো,' জবাব দিল কিশোর।

'ডাক দেব নাকি?'

'কি জন্যে?'

'কার জন্যে এত মাংস কিনছেন জিজ্ঞেস করতাম।'

'জন্তু-জানোয়ারের অভাব আছে নাকি তাঁর চিড়িয়াখানায়। ঠিক আছে, করতে চাইলে করো।'

বেরিংটন পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জানালা দিয়ে মুখ বের করে ডাক দিল মুসা, 'কেমন আছেন, মিস্টার বেরিংটন!'

ফিরে তাকালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন। 'আরে, তোমরা!' মাংস কেন কিনেছেন, জিজ্ঞেস করতে হলো না। নিজে থেকেই বললেন, 'আমার একটা বাঘিনীর জন্মদিন আজ। ভাবলাম, রাতে একটা পার্টি দিলে মন্দ হয় না। গরুর গোশত কিনলাম। এখন বাকি মোমবাতি আর পার্টি হ্যাট কেনা।' হাহ্ হাহ্ করে প্রাণখোলা হাসি হাসলেন তিনি। 'পরে দেখা হবে,' বলে কাছেই পার্ক করে রাখা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

'কিছু কিছু মানুষের জন্যে দুনিয়ার তাবৎ খুশি ঢেলে দিয়েছে যেন আল্লাহ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুসা বলল। 'বনের বাঘ, তারও আবার জন্মদিনের উৎসব। লোকটা পাগল!'

'হুঁ।'

'আমাদের দাওয়াত করলেও কিন্তু পারতেন।'

হাসল কিশোর, 'কেন, বাঘের সঙ্গে বসে গরুর মাংস খাওয়ার সখ হয়েছে নাকি?'

'না, দ্বীপটা দেখতাম। শোনার পর থেকেই দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'রবিনেরও একই ইচ্ছে। কিন্তু যাঁর জায়গা তিনি না বললে যাই কি করে!'

গাড়ির ট্রাংকে বাক্স দুটো তুললেন বেরিংটন। তিন গোয়েন্দার দিকে হাত নাড়লেন। তারপর গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

বসে রইল দুই গোয়েন্দা, ওয়ালথ্রপদের অপেক্ষায়।

ছয়টা বাজার কয়েক মিনিট আগে রক মিউজিক কানে এল কিশোরের। গাড়িতে বাজছে। ফিরে তাকাতে দেখল খানিক দূরে থেমেছে জরাজীর্ণ সবুজ শেভ্রলেটা। ভলিয়ুম বাড়িয়ে দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে ওয়ালথ্রপরা। ও দুটোও আরেক ধরনের পাগল, মনে হলো কিশোরের।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল নিক। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে হ্যাংওয়েতে ঢুকল। নেমে তার পিছু নেবে কিনা ভাবছে কিশোর, এই সময় রায়নাও নামল। ধীরে সুস্থে হেঁটে চলে গেল বাড়িটার পাশ দিয়ে পেছন দিকে।

'কোথায় গেল?' রায়না অদৃশ্য হয়ে যেতেই বলে উঠল মুসা। 'শিওর, কোন মতলব আছে ওদের।'

'আমারও তাই ধারণা,' কিশোর বলল। 'এক কাজ করো, আমি গাড়িতে বসে সদর দরজার দিকে চোখ রাখছি, নিক বেরোয় কিনা দেখব। তুমি গিয়ে দেখো রায়না কি করে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নেমে গেল মুসা। দ্রুত এগোল বাড়িটার দিকে।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। মুসা ফিরছে না শেষ পর্যন্ত আর বসে থাকতে পারল না। সে-ও নেমে এগিয়ে চলল বাড়ির পাশ

দিয়ে। বাতাসে মাংস আর রক্তের তীব্র গন্ধ। আবর্জনা ফেলার বড় বড় কয়েকটা ট্র্যাশ বিন দেখতে পেল। মুসা বা আর কাউকে চোখে পড়ল না।

সাবধানে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল সে। প্রায় পৌঁছে গেছে বাড়িটার পেছন দিকে। এখনও কারও দেখা নেই। কি হলো মুসার? থামল না সে। এগিয়েই চলল। অন্য পাশে গিয়ে দেখার ইচ্ছে।

'কিশোর!' আচমকা বাতাস চিরে দিল যেন মুসার কণ্ঠ। 'কোথায় তুমি?'

চমকে গেল কিশোর। ডাকটা এসেছে বাড়ির সামনের দিক থেকে। ঘুরে দৌড় দিল। দেখল, রায়না ওদের গাড়ির দিকে দৌড়াচ্ছে, মুসা ছুটছে তার পিছু পিছু।

দরজা খুলে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে ড্রাইভিং সীটে পড়ল রায়না। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। তীব্র গতিতে গাড়ি ঘোরানোর সময় আর্তনাদ করে উঠল টায়ার।

'জলদি এসো!' প্রবল বেগে হাত নেড়ে কিশোরকে ডাকতে লাগল মুসা। 'আমাকে দেখেই দৌড় মারল। নিশ্চয় কোন অঘটন ঘটানোর তালে আছে। ধরতে হবে ওকে।'

কিশোর তার পাশে উঠে দরজা লাগানোর আগেই স্টার্ট দিয়ে ফেলল মুসা।

দ্রুত ছুটছে রায়না। দুই গোয়েন্দাকে খসানোর চেষ্টা করছে। পথের শেষ মাথায় আরেকটা বাঁক। তীব্র গতিতে সেটা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর একই গতিতে মুসাও বেরিয়ে এল। কয়েক ব্লক দূরে আবার বাঁক নিতে দেখা গেল শেভ্রলেটাকে। ঢুকল গিয়ে একটা গলিতে।

কোন দিকে না তাকিয়ে মুসাও গাড়ি ঢুকিয়ে দিল গলির মধ্যে। সরু রাস্তা। দুই ধারে ইঁটের বাড়ি। সবগুলো বাড়িরই পেছন দিক এটা।

'ওই যে, থেমে গেছে!'

কয়েক গজ দূরে থেমে গেল সবুজ গাড়িটা।

'থেমেছে কি আর সাধে,' কিশোর বলল, 'বেরোনোর পথ নেই। দেখছ না ডেড এনড—গলির মুখ বন্ধ। দিলাম ফাঁদে ফেলে।'

'তাই মনে হচ্ছে, না?' চাবুকের মত শপাং করে উঠল তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকাল দুই গোয়েন্দা। পেছনের সীটে উঠে বসেছে নিক ওয়ালথ্রপ। মেঝেতে পড়ে ছিল এতক্ষণ। সামনের দিকে ঝুঁকে এল সে। ঝাঁকি লেগে নেচে উঠল তার ঘোড়ার-লেজ চুল।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা ছুরির ফলা চেপে বসল কিশোরের গলায়।

# পনেরো

ইস্পাতের শীতল স্পর্শ। না দেখেও বুঝতে পারছে কিশোর, হান্টিং নাইফ। অসম্ভব ধারাল।

'নড়বে না!' ছুরির ফলাটার মতই শীতল নিকের কণ্ঠ। 'জবাই হয়ে যাবে তাহলে।'

ফিরে তাকাল মুসা। চিন্তা করল, ছুরিটা কেড়ে নেয়া যায় কিনা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে হাতটা এগিয়ে নিয়ে চলল সেদিকে।

আচমকা একটা দড়ির ফাঁস নেমে এল তার গলায়। হ্যাঁচকা টানে পেছনে চলে গেল মাথাটা।

'কাজেই বুঝতেই পারছ,' দড়িটা টানটান করে ধরে রেখে, মুসার দিকের জানালার কাছে ঝুঁকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রায়না, 'উল্টোপাল্টা কিছু করতে যাওয়ার ফলাফল সুখের হবে না।'

'আমি আবার কি করতে গেলাম?' না বোঝার ভান করল মুসা, দুর্বল কণ্ঠস্বর।

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। বুঝে গেছে, ওয়ালথ্রপরা ফাঁদ পেতেছিল ওদের জন্যে। আর তাতে বোকার মত ধরা দিয়েছে ওরা। শহরের নির্জনতম এলাকায় তারচেয়েও নির্জন একটা গলিতে এনে ঢোকানো হয়েছে ওদের। কেউ দেখতে পাবে না। কেউ সাহায্যের হাত বাড়াতে আসবে না।

'কি চান আপনারা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তথ্য,' জবাব দিল নিক। 'তোমাদের এই অপারেশনের নেতা কে?'

'কিসের অপারেশন?' অবাক হলো কিশোর।

'অপারেশন অ্যালিগেটর–নামটা অবশ্য আমরা দিয়েছি, আমি আর রায়না। অনেক কিছু জেনে গেছি আমরা। জেনেছি, ফ্লোরিডা থেকে অ্যালিগেটরের চামড়া জাহাজে করে এখানে ডিলারের কাছে আসে। সেই ডিলার সেগুলো ফ্রান্সে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। তৈরি করা হয় দামী দামী বেল্ট, ওয়ালেট, পার্স।'

নিক থামতেই রায়না বলে উঠল, 'ফ্রান্সের একজন সোর্স আমাদের জানিয়েছে, ওখানে চামড়া যায় রকি বীচ এলাকা থেকে। জাহাজে করে কবে কবে পাঠানো হয়েছে, তার কিছু তারিখও আমাদের জানিয়েছে সেই সোর্স। তদন্ত করে আমরা বের করেছি, চামড়াগুলো পাঠানো হয়েছিল প্যাসিফিক এক্সপোর্টারের মাধ্যমে।'

রায়না থামতে আবার নিক শুরু করল, 'হ্যাংওয়ের গরুর মাংস ভরা বাক্সে করে সেগুলো পাঠানো হয়। ওদের কাছ থেকে গরুর মাংস কেনো তোমরা, মাংসটা বের করে ফেলে দিয়ে সেই এয়ারটাইট বাক্সে ভরো অ্যালিগেটরের চামড়া। প্যাসিফিক এক্সপোর্টার মনে করে গরুর মাংস পাঠাচ্ছ তোমরা, আসলে যে কি পাঠানো হচ্ছে সেটা তো কল্পনাও করতে পারে না।'

রায়না বলল, 'প্যাসিফিক এক্সপোর্টারে খোঁজ নিয়েছি আমরা। ওরা জানিয়েছে কাল তোমরা আরও বাক্স পাঠানোর ব্যবস্থা করেছ। তখন খোঁজ নিলাম হ্যাংওয়েতে। কিছু তারিখ দেখতে পেলাম, যে তারিখগুলোতে একটা বিশেষ কোম্পানি প্রতিবারে প্রচুর মাংস কিনেছে ওদের কাছ থেকে। আজ বিকেল ছয়টায় এক পার্টিকে মাংসের বড় একটা অর্ডার সাপ্লাই দেয়ার কথা হ্যাংওয়ের। এখন বুঝতে পারছি, তোমরাই সেই পার্টি।'

'তোমাদের পেছনে লেগেছি আমরা, এটা তোমরা আঁচ করে ফেলেছিলে,' কিশোরের গলায় ছুরির চাপ বাড়াল নিক। 'সেজন্যেই আমাদের অফিসে গিয়েছিলে খোঁজ নেয়ার জন্যে। তাই না?'

'না, পুরোপুরি ভুল করছেন আপনারা,' ঢোক গিলতে গিয়ে থেমে গেল

কিশোর। নাড়াচাড়ায় গলার চামড়া কেটে যাওয়ার ভয়ে।

'দেখো, তোমরা ছেলেমানুষ,' কণ্ঠস্বর নরম করল নিক। 'আমরা জানি, দলের বড় ধরনের কিছু নও তোমরা, বস্ তো নওই। হয়তো হেরোইনের টাকা জোগাড়ের জন্যে, কিংবা শয়তান আঙ্কেলের খপ্পরে পড়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছ। বসের নামটা বলে দাও, তোমাদের ছেড়ে দেব।'

'বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে,' জবাবটা দিল মুসা, 'অ্যালিগেটরের চামড়া সাপ্লাই দেয়, এমন কাউকে চিনি না আমরা। কখনও দেখা হয়নি। হলে আপনাদের আগে আমরাই ওর ঘাড়টা মটকাতাম।'

'হাসি-মস্করার সময় নেই!' আহত চিতার মত ফুঁসে উঠল রায়না। 'জলদি বলো!' মুসার গলার দাঁড়তে টান পড়ল।

কিশোর বলল, 'আপনারা তো আপনাদের কথা বললেন, এবার আমাদের কথা শুনুন। বলার তো অন্তত সুযোগ দেবেন…'

'বলো,' নিক বলল।

গত কয়েক দিনের কথা খুলে বলল কিশোর। মাঝে মাঝে তাকে কথা ধরিয়ে দিল মুসা। ওরা জানাল, কিভাবে এ.আর.এফদের অফিসে গোপনে ঢুকেছে, ওয়ালথ্রপদের অনুসরণ করে ফারের কোট রাখার গুদামে গিয়েছে, ফোন ট্যাপ করেছে। ওরা যে সখের গোয়েন্দা, সে-কথাও জানাল। বলল, বিশ্বাস না করলে থানায় খোঁজ নিতে।

'কি সর্বনাশ!' স্বামীর দিকে তাকাল রায়না। 'এ কাদের পেছনে লাগলাম আমরা? ভুল টার্গেট!'

'সাড়ে ছ'টা!' ঘড়ি দেখে বলল নিক। 'হ্যাংওয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। আসল লোকগুলোকে আর ধরা হলো না আজ!'

ফোঁস ফোঁস করে হতাশার নিঃশ্বাস ফেলল স্বামী-স্ত্রী দুজনেই।

'আমার কিছু কথা আছে,' কিশোর বলল।

'কি কথা?' জানতে চাইল নিক।

'আগে ছুরি আর দড়ি সরান।'

সরিয়ে নেয়া হলো।

'গাড়িতে দম আটকে আসছে,' কিশোর বলল। 'বাইরে নামা যাক। খোলা বাতাসে মগজ কাজ করবে ভাল।'

বন্ধ গলিতে, গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কিশোর ও মুসা। ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দুই ওয়ালথ্রপ। বিকেল বেলা আবহাওয়া দিনের চেয়ে ঠাণ্ডা এখন, তাও ভীষণ গরম।

'মনে হচ্ছে,' হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল কিশোর, 'একই ব্যক্তিকে খুঁজছি আমরা সবাই।'

'মানে?' ভুরু নাচাল রায়না।

'এ অঞ্চলে যদি কোন চামড়া চোরাচালানি থেকে থাকে,' কিশোর বলল, 'শুধু কুমির নয়, তুষার চিতার চামড়ার ব্যাপারেও আগ্রহী হবে সে। ঠিক? কারণ তুষার চিতার চামড়ার অস্বাভাবিক দাম।'

'হওয়াটাই স্বাভাবিক,' চোয়াল ডলল নিক। 'তাতে কি?'

গাড়িতে রাখা সেলুলার ফোন বেজে উঠল। তুলে নিল মুসা।

'রবিন করেছে,' কানে লাগিয়ে বলল সে। মন দিয়ে শুনল ওপাশের কথা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চন্দ্রাবতীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ওরা জানিয়েছে, ভানুস্বামী কিছুটা অস্থির প্রকৃতির; তবে ছেলে খারাপ নয়। ওরা কোনমতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না সে রাজকুমারীকে কিডন্যাপ করেছে। থানায় অফিসার মরিস ডুবয়ের সঙ্গেও কথা বলেছে রবিন। পুলিশ এখনও কোন হদিস করতে পারেনি রাজকুমারীর। আমাদের মতই বোকা বনে রয়েছে।'

'হুঁ!' ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর।

'কি হলো, কি ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এইমাত্র মনে পড়ল, আরও একজনকে দেখেছি আমরা।'

'আশ্চর্য! কাকে আবার দেখে ফেললে? শোনালাম তো রবিনের ফোনের কথা...'

'হ্যাঁ, রবিন কোন নতুন তথ্য জানাতে পারেনি।...শোনো, হ্যাংওয়েতে আজ ছ'টার সময় আরও একজনকে দেখেছি আমরা।'

'সন্দেহজনক কেউ?' জিজ্ঞেস করল রায়না।

'ছ'টা বাজার সামান্য আগে।' তার দিকে তাকাল কিশোর, 'ওই লোকই আপনাদের চামড়া ব্যবসায়ী কিনা কে জানে।'

মাংসের বাক্স হাতে বেরিংটনকে হ্যাংওয়ে থেকে বেরোতে দেখেছে, জানাল কিশোর।

'কি বলছ তুমি!' চমকে গেল মুসা। 'মাথাটাথা ঠিক আছে তো? তিনি একজন কোটিপতি। চামড়ার অবৈধ ব্যবসা করার কোন কারণ নেই। নিজের পোষা বাঘের জন্যে মাংস কিনে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে আমি তো সন্দেহের কিছু দেখি না।'

'আমিও না,' রায়না বলল। 'তাঁর মত একজন মানুষ এ রকম কাজ করতেই পারেন না। জন্তু-জানোয়ারকে ভালবাসেন তিনি...'

'ওটা লোক দেখানো,' কিশোর বলল। 'নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্যে চালাকি।'

'দেখো, বেরিংটনের বিরুদ্ধে খারাপ কিছু বলার আগে দশবার চিন্তা করা উচিত আমাদের,' সাবধান করল মুসা।

'করেছি,' মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'জু আইল্যান্ডে গিয়ে দেখলেই আমার কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই হয়ে যাবে। আজ রাতেই যেতে পারি আমরা। দেখে ফেললে, কেন গিয়েছি, একটা গল্প বানিয়ে বলে দেব। সন্দেহজনক কিছু দেখলে, পুলিশকে জানাব। কিছু না দেখলে, বেরিংটনকে যে সন্দেহ করেছি, এ কথাটাও বুঝতে দেব না। অনুমতি না নিয়ে গিয়েছি বলে মাপটাপ চেয়ে নেব। ঝামেলা হবে না আর।' ভুরু নাচাল মুসার দিকে তাকিয়ে, 'কি বলো?'

'ঠিক আছে,' ঠিক মেনে নিতে পারছে না মুসা, 'তুমি যা ভাল বোঝো।'

ওয়ালথ্রপদের দিকে তাকাল কিশোর, 'দেখুন, যদি কিছু মনে না করেন, আপনাদের কয়েকটা পরামর্শ দিতে চাই।'

চোখ সরু করে কিশোরের দিকে তাকাল নিক, 'কি পরামর্শ?'

'জন্তু-জানোয়ারের নাগরিক অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছেন, ভাল কথা। চাইলে আমাদেরও দলে টেনে নিতে পারেন। কিন্তু বোমাবাজি, বিষাক্ত সাপ আর ছুরি দিয়ে ভয় দেখানো, এগুলো সন্ত্রাসীদের কাজ। পুলিশ জানতে পারলে সোজা ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দেবে। ল্যাবরেটরি থেকে জানোয়ার চুরি করাও কোন ভাল কথা নয়, সেটা যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক না কেন,' বলে আড়চোখে স্বামী-স্ত্রীর দিকে তাকাল কিশোর। ওদের চেহারার পরিবর্তন দেখেই বুঝে ফেলল ঠিক জায়গাতেই ঢিল ছুঁড়েছে। 'আর, আরেকটা কথা, গোয়েন্দাগিরি আপনাদের কাজ নয়; কাজেই এ থেকে সরে থাকারও অনুরোধ জানাচ্ছি।'

'তোমাদের কথা কেন শুনব আমরা?' রেগে উঠল নিক।

'শোনা না শোনা আপনাদের ইচ্ছে,' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে হাত ওল্টাল কিশোর। 'তবে আপনাদের কিছু কিছু অপকর্ম আমরা দেখে ফেলেছি, এই যেমন গুদামের দরজায় বোমা মারা···এই একটা খবর পুলিশের কানে দিলেই···' কথাটা শেষ করল না সে।

স্তব্ধ হয়ে থাকা দুই ওয়ালথ্রপের দিকে আর একটিবারের জন্যেও না তাকিয়ে গাড়িতে চড়ল কিশোর। মুসাকে উঠতে বলল।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি পিছাতে শুরু করল মুসা। হেসে বলল, 'নিয়েছ এক হাত। মুখের অবস্থা দেখেছ? বেচারাদের জন্যে মায়াই লাগছে আমার।'

'এটা ওদের প্রাপ্য ছিল। ভাগ্যিস তখন ওদের রেখে যাওয়া সাপটা রবিনের হাত কামড়ে দেয়নি।' গলি থেকে বেরিয়ে এলে কিশোর বলল, 'হুমকি তো দিয়ে এলাম। এতেও যদি কাজ না হয়, বাড়াবাড়ি করে, দেব ডুবয়কে সব কথা জানিয়ে। ওদের কথা থাক এখন,' ফোনটা তুলে নিল সে। 'রবিনকে ফোন করা দরকার। মেরিনায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বলি।'

'যাব কি করে দ্বীপে?' সামনের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'বোট ভাড়া করব।'

# ষোলো

দুই ঘণ্টা পর একটা পাওয়ার বোট এগিয়ে চলল প্রশান্ত মহাসাগরের জল কেটে। মুসা ধরেছে হুইল, একটা হাত স্টিয়ারিংয়ে রাখা, আরেক হাতে পীনাট বাটার আর জেলির পুর দেয়া আধখাওয়া স্যান্ডউইচ। ধীরে ধীরে চিবুচ্ছে। চোখ সামনে সাগরের দিকে। পাশে বসা কিশোর। কোলের ওপর একটা ম্যাপ বিছানো। পেছন থেকে তার কাঁধের ওপর দিয়ে টর্চ ধরে রেখেছে রবিন।

'দশ ডিগ্রি ডানে কাটো,' মুসাকে বলল কিশোর। 'আমার হিসেব ঠিক হলে আর বিশ মিনিটের মধ্যে দ্বীপে পৌঁছে যাব আমরা।'

দুই কামড়ে বাকি স্যান্ডউইচটুকু মুখে পুরে দুহাতে স্টিয়ারিং ধরল মুসা। ডানে

ঘোরাল। বোটের ছাত থেকে জোরাল একটা আলো গিয়ে পড়েছে পানিতে। বাকি সমুদ্র অন্ধকার। চাঁদ নেই, তারার আলোও নেই। ম্যাপ আর যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভর করে বোট চালাতে হচ্ছে। হিসেবে ভুল হলে দ্বীপটা খুঁজে পাবে না।

চোখে দূরবীন ঠেকিয়ে দেখতে লাগল। সামনে কালোমত কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। আরও এগোনোর পর বোঝা গেল, হিসেব ভুল হয়নি, দ্বীপটাই।

নিঃসঙ্গ একটা দ্বীপ মাথা তুলে রেখেছে সাগরের পানি থেকে। আরও কাছে গেলে দেখা গেল দ্বীপ ঘিরে রাখা বালির সৈকত, মাঝে মাঝে পাথর। এত বেশি গাছপালা, জঙ্গলের মত লাগছে।

দ্বীপের চারপাশে একবার চক্কর দিয়ে এল মুসা। ডক দেখতে পেল না। ভেড়াবে কোথায়? শেষে ছোট একটা পাথুরে খাঁড়িতে বোট ঢুকিয়ে দিল।

'আলো বা বাড়িঘর তো চোখে পড়ছে না,' ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বলল সে। 'যাব কোনদিকে?'

'দ্বীপটা তেমন বড় নয়,' বোট থেকে লাফ দিয়ে একটা পাথরের ওপর নামল কিশোর। 'বেরিংটন থেকে থাকলে তাঁকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে না।'

সৈকত ধরে এগোল তিনজনে। ঢুকল অন্ধকার জঙ্গলে। ঘন গাছপালা, ঝোপঝাড় যেন দুর্গ সৃষ্টি করে রেখেছে। হাঁটা মুশকিল। আগে আগে টর্চ হাতে এগোল রবিন। পেছনে কিশোর আর মুসা। মাঝে মাঝেই হোঁচট খাচ্ছে শিকড়ে, লতায় জড়িয়ে যাচ্ছে শরীর, বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঝোপের ডাল। জন্তু বা মানুষ কিছুই চোখে পড়ল না। জীবন্ত প্রাণী বলতে একমাত্র মশার ঝাঁক, গুঞ্জন তুলছে আর্দ্রতায় ভরা বাতাসে।

'খাইছে! কি মশার মশারে!' ক্রমাগত হাত চালাচ্ছে মুসা। চটাস চটাস চাটি মারছে।

'গরমও বটে,' কপালের ঘাম মুছল রবিন। 'বাতাস বলতে নেই।'

কাছেই কোনখান থেকে শোনা গেল নেকড়ের ডাক।

'বেরিংটনের চিড়িয়াখানার কাছে পৌঁছে গেছি মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল।

'আটকে রেখেছে ওটাকে, না ছাড়া?' মুসার প্রশ্ন। 'অনেকে তো আবার বুনো জানোয়ার দিয়ে পাহারা দেয়ায়।'

'ভাল কথা মনে করেছ,' চতুর্দিকে দ্রুত একবার টর্চের আলো ঘুরিয়ে আনল রবিন। গাছের মাঝের অন্ধকার ফাঁক-ফোকরগুলো দেখে নিল। নেকড়ে জাতীয় কোন প্রাণীকে চোখে পড়ল না।

কয়েক মিনিট পর বেরিংটনের ব্যক্তিগত অসাধারণ চিড়িয়াখানাটা দেখা গেল। এক জায়গায় গাছপালা কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। তার মাঝে তিরিশটা বড় বড় খাঁচা। প্রতিটিতে কোন না কোন জানোয়ার রয়েছে। বেশির ভাগই ঘুমন্ত। ছেলেদের সাড়া পেয়ে নড়েচড়ে উঠল কোন কোনটা।

'সংগ্রহ বটে!' বিস্ময় চাপা দিতে পারল না রবিন।

লোহার শিকের ওপাশে রয়েছে সাংঘাতিক সব জানোয়ার: লাল নেকড়ে, চিতাবাঘ, জাগুয়ার, চিতা, ওশেলট, জেব্রা, অরিক্স, কেপ বাফেলো, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের একটা পুরো পরিবার—ছানাগুলো গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে মায়ের কোলের

কাছে।

দুটো চিতাকে লম্বা হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল মাটিতে।

'পৃথিবীর দ্রুততম প্রাণী,' ফিসফিস করে বলল মুসা।

একটা খাঁচায় প্রায় সাদা রঙের একটা বাঘ দেখে রবিন বলল, 'এ রকম বাঘ জীবনে দেখিনি।'

'আর আমি দেখিনি এই প্রাণী,' সাদা একটা গণ্ডার দেখিয়ে বলল কিশোর। ঘুমন্ত গণ্ডারটা হাতির বাচ্চার সমান।

পরিচিত, তীক্ষ্ণ একটা ডাক চিরে দিল যেন রাতের বাতাস।

'কি ওটা?' বিড়বিড় করল কিশোর।

'মনে তো হচ্ছে তুষার চিতা,' রবিন বলল। 'কি ভাবে ডাকে ওরা, চন্দ্রাবতী কি বলেছিল, মনে আছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। পা টিপে টিপে সেদিকে এগোল ওরা। চিড়িয়াখানার অন্য প্রান্ত থেকে শোনা গেছে ডাকটা।

একটা খাঁচার ওপর রবিনের টর্চের আলো পড়তেই বলে উঠল মুসা, 'রাখো, রাখো; ধরো দেখি আলোটা!'

ধোঁয়াটে চামড়ার ওপর কালো ফুটকি। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল জানোয়ার দুটোকে কিশোর। অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

একটা জানোয়ার শান্ত ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। আরেকটা দাঁড়ানো। সবুজ চোখ মেলে দেখছে। কয়েক মুহূর্ত একভাবে চেয়ে থেকে বসে পড়ল ওটা। মাটিতে পড়ে থাকা কিসে যেন নাক ঘষতে লাগল। ভালমত না দেখেও বলে দিতে পারল কিশোর, কিসে ঘষছে। চন্দ্রাবতীর লাল শাড়ির টুকরো।

'কান্তা!' মুসাও চিনে ফেলেছে।

'তাহলে তোমার কথাই ঠিক, কিশোর; বেরিংটনই সব কিছুর মূলে,' টর্চটা নিভিয়ে দিল রবিন। 'কেউ দেখে ফেললে বিপদে পড়ব।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'চলো, বোটে ফিরে গিয়ে রেডিওতে কোস্ট গার্ডকে খবর দিই।'

'কিন্তু রাজকুমারী...' বলতে গিয়ে থেমে গেল মুসা। 'ওটা কি...'

এবারও কথা শেষ হলো না তার। আলো এসে পড়ল মুখে।

এক এক করে আলোটা ঘুরে গেল মুসা, কিশোর, রবিনের মুখে। পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে তিনজনেই।

'নড়বে না!' আদেশ দিল খসখসে একটা কণ্ঠ। 'বন্দুক আছে আমাদের হাতে।'

ধীরে ধীরে আলো সয়ে এল চোখে। তিনটে আবছা ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। মিথ্যে বলেনি ওরা, প্রত্যেকের হাতেই একটা করে হান্টিং রাইফেল। তাক করে রেখেছে তিন গোয়েন্দার দিকে।

'তাই তো বলি,' একটা রাইফেলের ব্যারেলের ওপর দিয়ে সামনে ঠেলে এল বেরিংটনের মুখ, 'রাত দুপুরে বোট নিয়ে আমার দ্বীপে নামার সাহস হয় কার! আরেকটু সাবধান হলে পারতে। পাহারা থাকতে পারে, ভাবা উচিত ছিল।'

'আ-আ-আমরা...' তোতলাতে শুরু করল মুসা, 'আমরা চলেই যাচ্ছিলাম...'

'এত তাড়া কিসের,' শব্দ করে হাসলেন বেরিংটন। 'এসেছ যখন, ঘরে এসো, বসো, চা খাও, তারপর ভেবে দেখা যাবে কি করা যায়।'

# সতেরো

'মিস্টার বেরিংটন, রাইফেল তাক করে রেখেছেন কেন আমাদের দিকে?' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পার্টি শুরু হচ্ছে কখন?'

'বাঘের জন্মদিন,' কিশোর বলল, 'কি করে কেক কাটে, মজা দেখার লোভটা সামলাতে পারলাম না। তাই চলে এসেছি। আপনার ফোন নম্বর নেই আমাদের কাছে, তাহলে ফোন করেই আসতাম। আশা করি কিছু মনে করেননি।'

এগিয়ে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে।

'সরি,' হাতটা ধরলেন না বেরিংটন, 'আমার মত বুড়ো শকুনকে বোকা বানাতে পারবে না। আমি জানি, তুষার চিতাটাকে তোমরা দেখে ফেলেছ। লাল শাড়ির টুকরোটাও দেখেছ। তোমাদের বোকা ভাবার কোন কারণ নেই।'

চালাকির মধ্যে গেল না আর কিশোর। 'আসলে আমরা বোকাই। আপনার কথা বিশ্বাস করেছিলাম। ভাল মানুষ ভেবেছিলাম আপনাকে...'

চাপা গর্জন শুনে ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, বাদামী রঙের একটা ওশেলট জ্বলন্ত চোখে বেরিংটনের দিকে তাকিয়ে আছে। কথাবার্তার শব্দে বেশির ভাগ জানোয়ার জেগে গেছে। অস্বস্তিভরে তাকিয়ে আছে মানুষগুলোর দিকে।

'রাজকুমারী কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

'আছে, কাছাকাছিই,' জবাব দিলেন বেরিংটন।

'কাছাকাছি কোনখানে?' এক পা এগিয়ে গেল মুসা।

মুহূর্তে রাইফেল কক করে ফেলল বেরিংটনের দুই সহকারী।

'বোকামি কোরো না, মুসা!' সাবধান করে দিল কিশোর।

বেরিংটনের মত তাঁর সঙ্গীরাও খাকি প্যান্ট আর সাফারি শার্ট পরেছে। বয়েস চল্লিশের কোঠায়। একজন শ্বেতাঙ্গ, অন্যজনের রঙ কালো। আফ্রিকান হবে।

'বুদ্ধিমান ছেলে,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন বেরিংটন। 'ফাঁকা বুলি যে ঝাড়ছি না আমরা, বুঝতে পেরেছ। এসো আমার সঙ্গে।'

রাইফেল কাঁধে ফেলে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। হাঁটতে শুরু করলেন। অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা। পেছন থেকে তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল দুই প্রহরী। পেছনে ডেকে উঠল কোন একটা জানোয়ার। টানা, লম্বিত কান্নার মত স্বর। নেকড়েই হবে।

'আপনি অ্যালিগেটরের চামড়ার অবৈধ ব্যবসা করেন, তাই না?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আজ বিকেলে যে মাংস কিনে এনেছেন, সেটা বাঘের জন্মদিনে পার্টি দিতে নয়। বাক্সগুলো প্রয়োজন ছিল আপনার। কুমিরের চামড়া ভরে ফ্রান্সে পাঠানোর জন্যে।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলেন বেরিংটন। বিস্ময় চাপা দিতে পারলেন না। 'বহু বছর ধরেই এ ব্যবসা করছি। তুমি জানলে কি করে?'

'জেনেছি। জানোয়ারগুলোকে খাঁচায় আটকে রেখেছেন কেন? চামড়ার জন্যে? সময় হলে মেরে চামড়াগুলো জায়গামত পাঠিয়ে দেবেন?'

'না। একটা হান্টিং ক্লাব চালাই আমি। খাঁচায় ভরা জানোয়ারগুলোকে দেখলে তো, সব বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় পড়ে। আমার দ্বীপে আসে শিকারীরা। টাকা দেয়। পছন্দ মত জানোয়ার শিকার করে। মাথাটা ট্রফি হিসেবে দিয়ে দেয়া হয় তাকে।'

'জানোয়ার আনেন কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'প্রচুর যোগাযোগ আছে আমার। আইনের লোকদের ঘুষ দিয়ে নরম করে রাখি। নানা দেশ থেকে দুর্লভ জানোয়ার নিয়ে আসি। আকাশ ছোঁয়া দাম দিয়ে কিনতে হয়। তবে আমার লস নেই। কিছু কিছু লোক আছে, দামের পরোয়া করে না, তারা চায় একটা অতি দুর্লভ প্রাণীর মাথা। এই যেমন, সাদা গণ্ডারটাকে মারার জন্যে আপনি হাজার ডলার খরচ করতে হবে তোমাকে।'

'আপনাকে এখনও জেলে ঢোকানো হয়নি কেন বুঝতে পারছি না!' রাগ সামলাতে পারল না মুসা।

'উইলি, গুলি করে শেষ করে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়,' শ্বেতাঙ্গ লোকটা বলে উঠল, কথায় ব্রিটিশ টান। জাতে ইংরেজ।

'না!' থাবা দিয়ে ঘাড় থেকে একটা মশা মারলেন বেরিংটন।

সামনে আবার খোলা জায়গা। গাছপালা পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। একটা সুন্দর দোতলা বাড়ি আছে ওখানে। পাথরে তৈরি। একশো বছরের কম হবে না বয়েস। সামনে একটা কাঠের ডেক। চারপাশ ঘিরে আলো জ্বলছে। উজ্জ্বল ফ্লাডলাইটের আলোয় আশপাশটা দিনের মত পরিষ্কার।

তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে 'এসো' বলে ডেকের ওপর উঠে গেলেন বেরিংটন। ওক কাঠের একটা দরজা খুলে দিলেন। ভেতরে ঢুকল সবাই। বিরাট একটা হলঘর। কাঠের প্যানেলিং করা। একধারে পাথরের মস্ত ফায়ারপ্লেস।

চতুর্দিকে, ঘরের দেয়ালে সাজানো শিকার করা জন্তু-জানোয়ারের মাথা। খাঁচায় যত রকম প্রাণী দেখে এসেছে তিন গোয়েন্দা, সব রকম আছে এখানেও; তফাৎটা হলো ওগুলো জীবন্ত, এগুলোর কেবল মাথা। এ ছাড়া বাড়তি রয়েছে একটা নর্থ আমেরিকান বাইসনের বিশাল মাথা।

রবিন জানে, চোখগুলো কাঁচের তৈরি। তবু ওগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন গা ছমছম করতে লাগল। তার হাঁটাচলা, কথা বলা, সব লক্ষ করছে যেন প্রাণীগুলো।

সবাইকে বসতে ইশারা করলেন বেরিংটন।

প্রায় বুড়ো একজন লোক আর একজন মহিলা ঘরে ঢুকল। নরম স্বরে অনুরোধের মত করে মহিলাকে বললেন বেরিংটন, 'ইভিলিন, আমাদের একটু চা দেবে? আইস্‌ড্‌ টী।' লোকটাকে বললেন, 'লিওনার্ড, এয়ার কন্ডিশনারটা চালু করে দাও।'

সবাই বসলে মুসা বলল, 'কান্তাকে চুরি করে এনেছেন আপনি, যাতে

মাথামোটা কোন শিকারী এসে খুন করতে পারে ওকে।'

'না, এরচেয়ে বড় কিছু আশা করছি আমি কান্তার কাছ থেকে,' একটা কফি টেবিলে দুই পা তুলে দিলেন বেরিংটন। একটা সেলুলার ফোন রাখা আছে টেবিলে। 'বোম্যান যখন আমার কাছে আমার তুষার চিতাটা ধার চাইল, মনে হলো, ওকে দিতে যাব কেন? আমিই এনে প্রজনন করাতে পারি। বাচ্চাগুলো আমার নিজের হয়ে যাবে। চারটা বাচ্চা পেলে, প্রতিটার দাম পঁচিশ হাজার করে লাখ টাকা। কম কি। অনেক শিকারী আছে বাচ্চার মাথা পেলেও লুফে নেবে।'

ঘৃণায় তেতো হয়ে গেল রবিনের মন। লোকটা মানুষ না। টাকার জন্যে পিশাচে পরিণত হয়েছে। যে সব কোটিপতি জানোয়ারগুলোকে খুন করতে আসে, ওরাও মানুষ না।

'হুঁ!' হাঁটু খামচে ধরল কিশোর। আগে বুঝতে পারেনি বলে নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। 'এই সহজ চিন্তাটা আমার মাথায় আসেনি। কি করে আসবে? আপনাকে তো আর চোর ভাবতে পারিনি প্রথম থেকে।'

'চিড়িয়াখানা থেকে বের করলেন কি করে চিতাটাকে?' জানতে চাইল রবিন।

আফ্রিকান লোকটার দিকে তাকালেন বেরিংটন। চোখের ইশারা করে বললেন, 'বলো?'

'বেড়া কেটে ভেতরে ঢুকে প্রথমে পাখিগুলোকে ছেড়ে দিলাম,' লোকটা বলল। 'গোলমালের মধ্যে চিতাটার খাঁচার তালা খুলে ওটাকে ট্র্যাংকুইলাইজার দিয়ে ঘুম পাড়ালাম। বের করার পর আবার তালাটা লাগিয়ে দিলাম। যাতে ধাঁধায় পড়ে যায় পুলিশ।'

'তারপর, বোকা গার্ডগুলো যখন পাখি ধরায় ব্যস্ত,' শ্বেতাঙ্গ লোকটা বলল, 'বেড়ার ফোকর দিয়ে বের করে নিয়ে এলাম চিতাটাকে। অতি সহজ।'

'কিন্তু আনার পর পড়লেন ঝামেলায়,' কিশোর বলল, 'তাই না? খেতে চাইল না চিতাটা।'

'না, চাইল না,' বেরিংটন বললেন। 'পরদিন তাই আবার গেলাম চিড়িয়াখানায়। বোম্যানের কাছে জানলাম, রাজকুমারীর গন্ধ না পেলে খায় না চিতাটা। শাড়ির টুকরো ব্যবহারের কথা ভাবলাম। বোম্যানের অফিসে তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, মনে আছে? সেদিন বিকেলেই চন্দ্রাবতীর ডরমিটরির ঘরে শাড়ি চুরি করতে ঢুকলাম। রাজকুমারী যে ঢুকে পড়বে আমি থাকতে থাকতে, ভাবিনি। আমাকে দেখে ফেলল। বাধ্য হয়ে তুলে নিয়ে আসতে হলো ওকে।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে মুসা। আহত বাঘের মত ফুঁসছে সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে বেরিংটনের ঘাড়ে।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকল ইভিলিন। পিশাচ বেরিংটনের চা খেতে ঘৃণা হচ্ছে রবিনের, কিন্তু গলাটা শুকিয়ে এমন খসখসে হয়ে গেছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুলে নিল একটা গ্লাস।

'আমার ট্রফিগুলো কেমন লাগছে?' গর্বিত ভঙ্গিতে দেয়ালে সাজানো মাথাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন বেরিংটন। 'পৃথিবীর সমস্ত দেশ ঘুরেছি আমি। শিকার করেছি। আফ্রিকায় সেরেঙ্গেটির বিশাল প্রান্তর থেকে শুরু করে মেরুর

বরফে ঢাকা দুর্গম পাহাড়, সবখানে গেছি। আমার এই সঙ্গী দুজনও খুব বড় শিকারী।'

বাইসনের মাথাটার দিকে নজর গেল রবিনের। কাঁচের চোখ মেলে যেন ব্যঙ্গ করছে শিকারীকে।

'আপনার মত নিষ্ঠুর লোক জীবনে দেখিনি আমি, মিস্টার বেরিংটন,' আগুনের গনগনে তাপ বেরিয়ে এল মুসার কণ্ঠ থেকে।

'হয়তো,' মুসার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন বেরিংটন।

'নিজেকে আবার নেচারালিস্ট বলেন আপনি,' লোকটার কথা সহ্য করতে পারছে না রবিন।

'খোকা, সত্যি আমি নেচারালিস্ট,' চায়ের গ্লাসে চুমুক দিলেন বেরিংটন। 'প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম-কানুনে বিশ্বাসী। প্রকৃতি যে ভাবে চালাতে চায়–সবল দুর্বলের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকবে, সেটাকেই সঠিক বলে মানি আমি। প্রকৃতি নিয়ম করে দিয়েছে হরিণ ঘাস খাবে, হরিণকে খাবে বাঘ; সেটাই হয়, হওয়া উচিত। অন্য কিছু করতে গেলেই প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে।'

'সেটা নাহয় মেনে নিলাম,' কিশোর বলল। 'কিন্তু অহেতুক মেরে মেরে প্রাণীকুলকে সাফ করে দিতে বলেনি প্রকৃতি। আপনি যে বিপন্ন প্রজাতি মেরে ফেলছেন, এর কি ব্যাখ্যা দেবেন?'

'প্রকৃতির নিয়মকে যদি একটা শেকল ধরা হয়,' গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন বেরিংটন, 'মানুষ রয়েছে শেকলের একেবারে মাথায়। হরিণের মাংস খেয়ে বাঘ যেমন বেঁচে থাকে, আমিও তেমনি বাঘ মেরে বেঁচে থাকার পয়সা রোজগার করি। এটা আমার প্রাকৃতিক অধিকার।'

'আমরা তো শুনেছিলাম,' রবিন বলল, 'আপনি মস্ত ধনী। জানোয়ার মেরে টাকা রোজগারের প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়।'

'আমার দাদার বাবা, যিনি এই দ্বীপটা কিনেছিলেন, তিনি ছিলেন বড়লোক। উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক টাকা পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু এমন জীবন বেছে নিলাম, দেখতে দেখতে সব টাকা ফতুর হয়ে গেল। শিকার ভালবাসি, তাই শেষ পর্যন্ত শিকারের ব্যবসাই বেছে নিলাম। স্বীকার করতেই হয়, অ্যালিগেটররা আমার মস্ত উপকার করেছে।'

চুমুক দিয়ে গ্লাসের চা শেষ করে ফেলল কিশোর। 'আপত্তি না থাকলে বলুন না শুনি আপনার ব্যবসার কথা।'

'ঠিক আছে, বলছি। এ ভাবে সব তোমাদের বলে দেয়াটা বোকামিই হয়ে যেত,' বেরিংটন বললেন, 'যদি ছেড়ে দিতাম। দিলে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে হয়। কে আর চায় সেধে জেলে যেতে। তারচেয়ে তোমাদের শেষ করে দিলেই ঝামেলা চুকে যায়।'

'ভয় দেখাচ্ছেন?' ফুঁসে উঠল মুসা।

'না,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন বেরিংটন, 'না, ভয় দেখানো না, সত্যি বলছি। আমি স্পোর্টসম্যান, তাই পালানোর সুযোগ দেব তোমাদের। যারা এখানে শিকার করতে আসে, তাদের সঙ্গে একটা খেলা খেলি আমি। জানোয়ার পছন্দ করে

শিকারী, দামদর ঠিক হলে সেটাকে বের করে জঙ্গলে ছেড়ে দিই। আট ঘণ্টা সময় দেয়া হয় শিকারীকে। এই সময়ের মধ্যে যদি মারতে পারে, ভাল, নইলে বেঁচে যাবে জানোয়ারটা। আমার জিনিস আমার কাছেই থাকবে। কিন্তু পুরো টাকা শোধ করতে হবে শিকারীকে। তার জন্যে এটা জুয়া, আর জানোয়ারটার জন্যে বাঁচার সুযোগ। তোমাদেরও সে-সুযোগ দিতে চাই।'

'তারমানে জানোয়ারের মত জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আমাদের শিকার করতে যাচ্ছেন আপনি?' ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। মনে পড়ল, ঠিক এ রকম আরেক উন্মাদের পাল্লায় পড়েছিল ওরা। একই কাজ করেছিল সেই লোকটাও। তবে সে-ও বোধহয় এত বিপজ্জনক আর নিষ্ঠুর ছিল না।

'ঠিক ধরেছ,' বেরিংটন বললেন। 'আমি যে অন্যায় করি না, তার প্রমাণ হিসেবে তোমাদের কথা দিচ্ছি, রাইফেল নেব না। তীর-ধনুক ব্যবহার করব। আর লুকানোর জন্যে আধঘণ্টা সময় দেয়া হবে তোমাদের। কেমন লাগছে?'

'আপনার যা ইচ্ছে আপনি করতে পারেন!' উঠে দাঁড়াল মুসা। রাগে জ্বলছে চোখ। 'আপনার খুন করতে ইচ্ছে হলে তাই করুন। কিন্তু ভীতু শিকারের মত ছুটে বেড়িয়ে কুৎসিত মজা পেতে আপনাকে দেব না।'

'ওর কথা বাদ দিন,' শীতল কণ্ঠে বেরিংটনকে বলল কিশোর, 'আপনার চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করলাম। কখন শুরু হবে?'

'এই তো সাহসী মানুষের মত কথা।' ঘড়ি দেখল বেরিংটন। 'এখনই তো সবচেয়ে ভাল সময়। রওনা হয়ে যাও। ঠিক বারোটার আগে তোমাদের পিছু নিচ্ছি না আমরা। আরেকটা কথা, দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা মনেও এনো না। তাতে অহেতুক মূল্যবান সময় নষ্ট করবে। তোমাদের বোট নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সাঁতরে পেরোনোর চেষ্টা করে লাভ নেই, সবচে' কাছের দ্বীপটা তিরিশ মাইল দক্ষিণে। যেতে পারবে না ওখানে।'

ঢোক গিলল কিশোর। মাথা ঝাঁকাল। বুঝতে পারছে, মিথ্যে বলছেন না বেরিংটন।

সামনের দরজার কাছে ছেলেদের এগিয়ে দিলেন বেরিংটন। দরজা খুলে দিলেন। ওরা বাইরে বেরোতে বললেন, 'তোমাদের সৌভাগ্য কামনা করছি। চমৎকার একটা অভিজ্ঞতার সুযোগ দিলে আমাকে। মানুষ প্রজাতিকে কখনও শিকার করিনি।' দরজাটা লাগিয়ে দিলেন তিনি।

ছুটে ডেক থেকে নেমে সামনের গাছপালার দিকে এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

ঘুরে দাঁড়াল মুসা। 'কাজটা ঠিক করলে না, কিশোর। কেন মজা পেতে দিলে শয়তানটাকে? তোমার ইচ্ছেটা কি?'

'বাঁচার সুযোগ করে নেয়া। তুমি যে ভাবে রাগ দেখাচ্ছিলে, তাতে লাভ হত না; মেরে আমাদের ফেলতই।'

"এখনও মরব। আমাদের ঠিকই ধরে ফেলবে,' থাবা দিয়ে মশার ঝাঁক তাড়ানোর চেষ্টা করল রবিন। 'দুর্ধর্ষ শিকারী ওরা। আর এ ধরনের শিকারীরা যা হয়, দুর্দান্ত ট্র্যাকার। সহজেই খুঁজে বের করে ফেলবে। আমাদের কাছে কোন অস্ত্রও

নেই যে বাধা দেব।'

'কে বলল নেই?' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটাই আছে, মগজ। এটা দিয়েই ওদের হারিয়ে দে। কথা বলে সময় নষ্ট হচ্ছে। বাড়ি থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যাওয়া দরকার।'

ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বলতা থেকে দ্রুত সরে গেল ওরা। ঢুকে পড়ল অন্ধকার গাছের জঙ্গলের গোলক-ধাঁধায়। এই গাছপালা আর ঝোপ কতখানি আড়াল দিতে পারবে, ভাবছে কিশোর।

কিশোরের কথা সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে রবিন আর মুসার। ওর মগজের ক্ষমতার ওপর অগাধ বিশ্বাস ওদের। মনে হচ্ছে, শিকারীদের ফাঁকি দিতে পারবে ওরা।

'প্ল্যান করে এগোনো উচিত আমাদের,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর, 'ভাল একটা প্ল্যান।'

'সেই প্ল্যানটা কি?' জানতে চাইল মুসা।

'ভাবো, ভাবতে থাকো,' কিশোর বলল। 'যার যা মাথায় আসে, বলব। তারপর সব মিলিয়ে একটা বুদ্ধি ঠিক করে নেব। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। হাঁটতে হাঁটতে বলো।'

স্যাঁতসেঁতে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রচণ্ড গরম। ঘাড়ের কাছ থেকে সড়সড় করে ঘামের ফোঁটা নেমে গেল কিশোরের মেরুদণ্ড বেয়ে।

'এখন থেকে পঁচিশ মিনিট পর,' রবিন বলল, 'রওনা হবে ওরা। ঘুরে তখন বাড়িটায় ফিরে যাব আমরা। হলঘরে সেলুলার ফোন দেখেছি। পুলিশকে ফোন করব।'

'কিন্তু বাড়িতে লোক আছে,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'বুড়ো-বুড়ি দুটো। ওগুলোকেও কম হারামী মনে হয়নি আমার।'

'ওদের ঠেকানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে,' কিশোর বলল। 'নিশ্চয় ওদের কাছে বন্দুক থাকবে না।'

'কিন্তু শিকারীরা সহজেই আমাদের পিছু নিয়ে বাড়িটায় গিয়ে উঠবে। পুলিশ আসার আগেই খুন করবে আমাদের।'

'আরেক কাজ করা যেতে পারে,' রবিন বলল। 'পানিতে নেমে সাঁতরে গিয়ে উঠব বাড়ির কাছে। তাতে আমাদের চিহ্ন খুব কম দেখতে পাবে ওরা।'

'হ্যাঁ, এ বুদ্ধিটা মন্দ না,' কিশোর বলল। 'তবে...'

কথা শেষ হলো না ওর। পায়ের নিচে মাটি ধসে পড়ল। হঠাৎ করে দেবে যেতে শুরু করল সে।

# আঠারো

বালির মেঝেতে আছড়ে পড়ল কিশোর। তার পর পরই পড়ল রবিন। ওপর দিকে

তাকিয়ে অনুমান করল, নয় ফুট গভীর একটা গর্তে পড়েছে। গর্তের মুখটা লতাপাতা দিয়ে ঢাকা ছিল।

গর্তের মুখের কাছে কিনার খামচে ধরে ঝুলে থেকে প্রাণপণে পতন রোধ করার চেষ্টা করছে মুসা।

'পড়ো না, মুসা, পড়ো না! ওঠার চেষ্টা করো,' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'তুমি পড়ে গেলে আশা-ভরসা সব শেষ। কোনমতেই আর বেরোতে পারব না আমরা।'

'চেষ্টা তো করছি,' গোঁ-গোঁ করে বলল মুসা। পিছলে গেল একটা হাত। নেমে এল কয়েক ইঞ্চি। মরিয়া হয়ে হাতটা সরিয়ে এনে থাবা মারল। জুতোর ডগা গর্তের দেয়ালে বসিয়ে দিয়ে আটকে থাকার চেষ্টা করল। ভাগ্য ভাল, হাতে ঠেকল একটা শিকড়। আঁকড়ে ধরল ওটা। বেয়ে উঠে গেল ওপরে। গর্তের বাইরে বসে একটা মুহূর্ত হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল নিচের দিকে।

'ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছিল,' জোরে জোরে বলল সে। 'জানোয়ারের জন্যে। যেন বন্দুকের শক্তিতে কুলাচ্ছিল না, নিরীহ জানোয়ারগুলোকে আটকানোর জন্যে ফাঁদেরও দরকার···মরুক ব্যাটারা! তোমাদের তুলে আনার ব্যবস্থা করছি।'

লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। হাত বাড়িয়ে দিল নিচে। অনেক কায়দা কসরত করে প্রথমে রবিনকে তুলে আনল। দুজনে মিলে তখন কিশোরকে তুলতে আর তেমন অসুবিধে হলো না।

গর্তে পড়ে অনেক সময় নষ্ট হলো ওদের। হাঁটতে শুরু করল আবার। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে রবিন। অবশেষে বলল, 'বারোটা বাজল। বেরিয়ে পড়েছে বোধহয় তিন পিশাচ। জলদি চলো, পানিতে গিয়ে নামি।'

'প্ল্যানটার সামান্য পরিবর্তন করছি আমি,' কিশোর বলল। 'তোমরা চলে যাও।'

'কি বলছ?' প্রায় চিৎকার করে উঠল মুসা। 'কেন?'

'শ্‌শ্‌শ্‌! আস্তে! টোপ হিসেবে একজন থাকলে সুবিধে হবে। চিহ্ন রেখে রেখে এগোব আমি। শিকারীরা আমার পিছু নেবে। এই সুযোগে সহজেই বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারবে তোমরা। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে।'

'সুযোগের দরকার নেই,' মানা করে দিল রবিন। 'তোমাকে টোপ বানিয়ে গুলির মুখে ফেলে সময় নিতে চাই না আমরা।'

'নিতে হবে!' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'এটাই সবচেয়ে ভাল বুদ্ধি। তোমরা কিছু একটা না করা পর্যন্ত যে ভাবেই হোক টিকে থাকব আমি। যাও, সময় নেই।' রবিনের কাঁধ চেপে ধরে এক ঝটকায় তাকে পানির দিকে ঘুরিয়ে দিল সে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রওনা হতে হলো রবিন আর মুসাকে। বুঝতে পারছে, কিশোরের বুদ্ধিটাই ভাল।

ঘুরে তাকিয়ে বলল রবিন, 'গুড লাক, কিশোর।'

হাসল কিশোর, 'তোমাদের জন্যেও একই কথা। বলা যায় না, শয়তানগুলো আমার পিছু না নিয়ে তোমাদেরও নিতে পারে।'

আর কিছু না বলে হাঁটতে শুরু করল রবিন আর মুসা। দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল গাছের দেয়ালের আড়ালে।

হঠাৎ, বড় একা লাগল কিশোরের। ও জানে, ওর এই পরিকল্পনায় মুসা আর রবিন অনেকটা সুযোগ পাবে; কিন্তু সে নিজে পড়ে গেল ভয়ানক বিপদের মধ্যে। তিনজন সশস্ত্র শিকারী ধেয়ে আসবে ওর দিকে, নিরস্ত্র অবস্থায় শুধু বুদ্ধির জোরে ওদের হাত থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। আজ রাতে মগজের যতখানি ক্ষমতা আছে ওর, সবটুকুকে কাজে লাগাতে হবে।

কান পেতে রইল সে। শোনার চেষ্টা করছে। কিন্তু জু আইল্যান্ডের নিজস্ব শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। খুব দুর্বল কোন রেডিও স্টেশন ধরার জন্যে টিউনিং করছে যেন।

কয়েক মিনিট পর দূর থেকে ভেসে এল কথার শব্দ।

মুহূর্তে বুকের দুরুদুরু তিন গুণ বেড়ে গেল ওর। খেলা শুরু। পরাজিত হলে নিশ্চিত মৃত্যু।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক কাছে চলে এল কথার শব্দ। অনেক স্পষ্ট।

'একেবারেই সহজ,' একজনকে বলতে শুনল কিশোর। 'রাখঢাকের চেষ্টা করে নি। চিহ্ন ফেলে গেছে। সোজা গর্তের দিকে এগিয়েছে মনে হয়।'

'গর্তেই পড়েছে কিনা কে জানে,' হতাশ হলো যেন ইংরেজ লোকটা। 'তাহলে মজাটাই মাটি।'

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। ভাবছে, কি করবে? গাছে চড়বে, যাতে নিচে দিয়ে চলে যায় শিকারীরা?

উঁহু, বাতিল করে দিল ভাবনাটা। ওপরে তাকিয়ে দেখে ফেললে আর পালানোর উপায় থাকবে না।

'যদি দেখা যায়,' বেরিংটন বলল, 'ভাগাভাগি হয়ে গেছে, তাহলে আমাদেরও ভাগ হয়ে যেতে হবে।'

হালকা পায়ে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। চলতে থাকাটাই ওর কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হলো। মুসা আর রবিন গিয়ে পুলিশকে ফোন না করা পর্যন্ত টিকে থাকতেই হবে আমাকে, মনকে বোঝাল সে।

মাটির দিকে নজর রাখা দরকার। আবার কোন গর্তে পড়লে, শেষ। কিন্তু অন্ধকারে কি করে নজর রাখবে? টর্চ জ্বালানোটা হয়ে যাবে মস্ত বড় ভুল।

'গর্তেই পড়েছিল,' কালো লোকটাকে বলতে শুনল কিশোর। 'দুজন। অন্য একজন টেনে তুলেছে ওদের।'

উঁচু মানের ট্র্যাকারের পাল্লায় পড়েছে, লোকটার কথায় নিশ্চিত হয়ে গেল কিশোর। কোন কিছুই চোখ এড়ায় না। ওর জন্যে তাকে ধরে ফেলাটা কোন ব্যাপারই না। শিকারীর তাড়া খেয়ে বুনো জানোয়ারের পালাতে কেমন লাগে হাড়ে হাড়ে অনুভব করল সে। পালানোর জন্যে আতঙ্কিত, মরিয়া।

'এদিকে,' কালো লোকটা বলল।

ঠিক আমার পেছনে লেগেছে, ভাবল কিশোর। ফাঁকি দেয়ার জন্যে কিছু একটা করা দরকার। জলদি।

তীক্ষ্ণ চিৎকার চিরে দিল রাতের নীরবতা।

তুষার চিতা। তার সঙ্গীটাও হতে পারে। তোদের মত আমারও অবস্থা হয়েছে

রে–মনে মনে বলল কিশোর।

হঠাৎ করেই বুদ্ধিটা এল মাথায়।

আবার ডেকে উঠল চিতাটা। ঘুরে গেল কিশোর। দ্রুত এগিয়ে চলল ডাক লক্ষ্য করে। কয়েকটা জানোয়ারকে ছেড়ে দেবে। তাতে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠবে শিকারীদের জন্যে। একা কিশোরের দিক থেকে মনোযোগ সরাতেও বাধ্য হবে। তাতে টিকে থাকার সময় পাবে সে।

জানোয়ারের খাঁচার কাছে পৌঁছে গেল সে। জেগে যাওয়া জানোয়ারগুলো শিকের ফাঁক দিয়ে তাকাতে লাগল ওর দিকে। ওগুলোকে ছেড়ে দেয়াটা তার নিজের জন্যেও বিপজ্জনক। কিন্তু সে এখন মরিয়া। ঝুঁকি নিতেই হবে।

প্রথমে এসে দাঁড়াল তুষার চিতার খাঁচার সামনে। পকেট থেকে মাস্টার কী বের করে তালায় ঢুকিয়ে দিল। কয়েক সেকেন্ডের চেষ্টাতেই খুলে ফেলল। মেঝেতে পড়ে থাকা রক্তমাখা একটা হাড় দেখে আশা করল, পেটু ভরে খেয়েছে চিতা দুটো, তার দিকে আর নজর দেবে না।

খুলে দিল খাঁচার দরজা।

পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দরজার দিকে এগোল চিতা দুটো। ধীরে সুস্থে বেরিয়ে এল। গভীর কৌতূহলে মাটিতে নাক নামিয়ে শুঁকতে শুরু করল।

'পালিয়ে যা!' খুব আস্তে, নরম স্বরে বলল কিশোর। 'কোন অসুবিধে নেই, কেউ কিছু বলবে না, চলে যা!'

ওর কথা বুঝল কিনা চিতা দুটো, বোঝা গেল না। কিন্তু কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন দিকে আর না তাকিয়ে দুই লাফে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

খুশিতে আরেকটু হলেই চিৎকার দিয়ে ফেলেছিল কিশোর। সামলে নিল। চিতা দুটোর আচরণ বুঝিয়ে দিল, তাকে আক্রমণের চেয়ে পালানোর দিকেই আগ্রহ বেশি ওদের। বাকি জানোয়ারগুলো কি করবে কে জানে! বন্দি করে রাখার কারণে মানুষের প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মেছে হয়তো ওদের। থাকগে, অত ভাবার সময় নেই।

সাদা বাঘের তালা খোলায় মন দিল সে। নীলা পাথরের মত হালকা নীল চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে বাঘটা।

'হাই, সুন্দরী,' মোলায়েম স্বরে কথা বলে ওটার সঙ্গে আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করল কিশোর. 'তোমার খালাত ভাই-বোন দুটোকে এইমাত্র ছেড়ে দিলাম। দেখেছ নিশ্চয়। তুমিও যাও।'

খাঁচার দরজাটা মেলে ধরল সে।

# উনিশ

পানি থেকে উঠে এল মুসা আর রবিন। একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

'বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি নিশ্চয়,' হাত দিয়ে মাথার পানি ঝেড়ে ফেলল রবিন।

'বিশ্রামের কি আর দরকার আছে?' মুসা বলল।

'উফ্, যা স্রোত ঠেলে এলাম। এক সেকেন্ড।'

দ্বীপের আরেক প্রান্ত থেকে একটা চিৎকার কানে এল ওদের। মানুষের বলে মনে হলো। তারপর আর কিছু না। কেবল পায়ের কাছে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ।

অন্ধকারে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কেউ কারও চোখ দেখতে পেল না।

'কিশোর না তো?' গলা কেঁপে উঠল মুসার।

'কি করে বলব!' স্বর বেরোচ্ছে না রবিনের গলা দিয়ে। 'হতে পারে...'

'না, পারে না,' জোর দিয়ে বলল মুসা। 'এত সহজে মরবে না কিশোর। চলো, বসে না থেকে আমাদের কাজটা সেরে ফেলি।'

সৈকতের বালি মাড়িয়ে গেলে পায়ের ছাপ পড়বে, তাই যতটা সম্ভব পাথরের ওপর থাকার চেষ্টা করল। সৈকত পেরিয়ে এসে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। কালো ছায়া গিলে নিল ওদের। ঘন গাছপালা আর ঝোপে ভরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ভেজা শরীর ও খালি পায়ে এগোতে গিয়ে এখন টের পেল কাজটা কত কঠিন।

তবে যত কঠিনই হোক, বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল শেষ পর্যন্ত। নিঃশব্দে উঠে এল ডেকে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, হলঘরে টেলিভিশন দেখছে বুড়ো-বুড়ি। কফি টেবিলে রাখা সেলুলার ফোনটার পাশে রাখা এখন একটা অটোম্যাটিক পিস্তল।

'ফোনটা দেখে ভালই লাগছে,' মুসা বলল, 'পিস্তলটা দেখে লাগছে খারাপ।'

দেয়ালে বসানো বিশাল বাইসনের মাথাটার দিকে তাকিয়ে রবিনের মনে হলো, ওটা যেন তাকে নীরবে বলছে: 'শিকারীগুলোকে কাছে আসতে দিয়ো না, খোকা; তাহলে আমার অবস্থা হবে তোমার মাথাটারও।'

'পেছনটা দেখে এলে কেমন হয়?' মুসা বলল। 'জানালা খোলা পেলে ঢুকতে সুবিধে হবে। বাড়িতে কোথাও না কোথাও নিশ্চয় আরও ফোন আছে।'

বাড়ির পেছনে এসে দেখা গেল, গ্রাউন্ড ফ্লোরে আরও জানালা আছে বটে, কিন্তু একটাও খোলা নেই।

'কাঁচ ভেঙে ঢোকা যায়,' রবিন বলল। 'কিন্তু শব্দ শুনে পিস্তল নিয়ে দৌড়ে আসবে বুড়োটা।'

দোতলার দু'একটা জানালার পাল্লা খোলা মনে হলো। অন্ধকার জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, 'ওসব ঘরের কোথাও রাজকুমারীকে রাখেনি তো?'

জবাব না দিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল রবিন। কি করা যায়, ভাবছে। খানিক দূরে একটা ছাউনি দেখা গেল, বোধহয় মালপত্র রাখা হয় ওটাতে। 'চলো তো দেখি, দড়িটড়ি কিছু পাওয়া যায় নাকি।'

নিঃশব্দে ছাউনির কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। দরজায় তালা। তৈরি হয়েই দ্বীপে এসেছে ওরা। পকেট থেকে আরেকটা মাস্টার কী বের করল রবিন। তালা খুলতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না। প্রথমে ভেতরে ঢুকল রবিন। গাঢ় অন্ধকার।

পেছন থেকে ওকে জাপটে ধরল কেউ। দাঁত বসিয়ে দিল কব্জিতে। উহ্ করে উঠল সে। ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরতে গেল। পড়ে গেল একটা ধাতব খাঁচার ওপর।

'কি হলো?' ঘরে ঢুকল মুসা।

'কে? মুসা নাকি? রবিন?' ফিসফিস্ করে বলল একটা কণ্ঠ।

মিটমিটে একটা আলো জ্বলছিল, এতক্ষণে লক্ষ করল রবিন। চাবি ঘুরিয়ে বাড়ানো হলো আলোটা। বাক্সের ওপর রাখা একটা লণ্ঠন। রাজকুমারী ঘুরে দাঁড়াল ওদের মুখোমুখি। চুল এলোমেলো, পোশাক দোমড়ানো–এ ছাড়া আর কোন পরিবর্তন নেই তার। সুস্থই আছে মোটামুটি।

'তোমাদের দেখে কি যে খুশি হলাম,' বলল সে। 'সরি, রবিন। আমি ভাবলাম বুড়ো শয়তানটা, সেজন্যেই কামড়ে দিয়েছি। দেখো, কি জায়গায় এনে রেখেছে আমাকে।'

'তুমি ভাল আছ তো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আছি। অন্তত যতটা খারাপ থাকার কথা ছিল, ততটা নেই।'

'শুনে খুশি হলাম।'

লণ্ঠনটা তুলে নিল রবিন। মুসা আর চন্দ্রাবতীকে বলল, 'তোমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আলোর কাছে যাবে না, ছায়ায় লুকিয়ে থাকবে। আমি দেখি, বাড়িতে ঢোকার জন্যে দড়িটড়ি পাওয়া যায় কিনা।'

বেরিয়ে গেল দুজনে। দরজাটা ভেজিয়ে দিল রবিন, খোলা দরজা দিয়ে আলো বেরোতে দেখলে কৌতূহলী হয়ে চলে আসতে পারে চাকরটা। মেঝেতে পড়ে আছে একটা স্লীপিং ব্যাগ। কিছু বাড়তি খাঁচা আছে। আর আছে ওগুলো মেরামতের কিছু যন্ত্রপাতি। একটা গোপন খুপরিতে এক বাক্স ট্র্যাঙ্কুইলাইযার ডার্ট পেয়ে গেল সে। সেদিন চিড়িয়াখানায় ছুটে যাওয়া বাঘটাকে কাবু করতে এ ধরনের ডার্ট ব্যবহার করা হয়েছিল, মনে আছে তার। ডার্ট ভরে ছোঁড়ার জন্যে তৈরি তামার নলও পেয়ে গেল। ডার্টগুলোর কথা নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলেন বেরিংটন, নইলে কোনমতেই রাজকুমারীকে যে ঘরে বন্দি করা হয়েছে, সেখানে রাখা হতো না। কিংবা হয়তো কেয়ারই করেনি।

চন্দ্রাবতীর চিৎকার শোনা গেল।

ধড়াস করে উঠল রবিনের বুক।

মাথা গরম করল না। এ সব পরিস্থিতিতে সাধারণত যা করার কথা, জোরে টান দিয়ে দরজা খুলে দেখতে গেল না কি হয়েছে। বরং আস্তে করে পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল।

একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে মুসা। ওর পাশে দাঁড়ানো চন্দ্রাবতী। একটা হাত চেপে ধরে রেখেছে মুসা। শান্ত হতে বলছে।

কি দেখে চিৎকার করেছে রাজকুমারী, বুঝতে পারল না রবিন। আরেকটু ফাঁক করল পাল্লা। গাছের সীমানার বাইরে, আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে চোখে পড়ল এতক্ষণে। শিকারীদের একজন, কালো লোকটা। হাতে একটা ধনুক। ইনডিয়ানদের ধনুকের মত, তবে অনেক ছোট। ক্রসবো বলে এগুলোকে। তাতে পালকের পুচ্ছ পরানো একটা ছোট তীর। তুলে ধরে রেখেছে ছোঁড়ার ভঙ্গিতে।

'চালাকিটা ভালই করেছিলে,' শয়তানি হাসি হেসে বলল লোকটা। 'তোমার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে পানির কিনারে চলে গেলাম। তারপর আর কিছু নেই।

অনুমান করে নিলাম, কোথায় গিয়েছ। দেখলে তো, ভাল ট্র্যাকার শুধু শিকারের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারে না সে কোনদিকে গেছে, চিহ্ন না দেখেও বলে দিতে পারে তার মনে কোন ভাবনা খেলা করছে। যাকগে, আমি আমার শিকার খুঁজে পেয়েছি।'

ধনুকটা আরেকটু তুলল শিকারী। মুসার হৃৎপিণ্ড নিশানা করল। ধীরে ধীরে ছিলায় টান দিয়ে বাঁকা করতে শুরু করল ধনুকটা।

দেখছে রবিন। এক্ষুণি কিছু করা দরকার। দেরি করলে মারা পড়বে মুসা।

# বিশ

এক দৌড়ে গিয়ে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে এল রবিন। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে লোকটাকে সই করে ছুঁড়ে মারল।

উড়ে আসা আগুন থেকে বাঁচাতে মাথা নিচু করে ফেলল লোকটা। ওর কাছেই মাটিতে পড়ল লণ্ঠন। নিভে গেল।

লাফ দিয়ে গাছের কাছ থেকে সরে গেল মুসা। তীর ছেড়ে দিয়েছে লোকটা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। শাঁ করে মুসার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল তীরটা। থ্যাক করে গিয়ে বিঁধল একটা গাছে। তূণ থেকে নিয়ে চোখের পলকে আরেকটা তীর ধনুকে পরিয়ে ফেলল শিকারী। চন্দ্রাবতীও বসে নেই। ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। হাতে কামড় মারল।

উহ্ করে উঠে তীর ফেলে দিয়ে হাত ছাড়ানোর জন্যে ঝাড়া মারল লোকটা।

মাথা নিচু করে ছুটে যাচ্ছে মুসা। লোকটা সবে হাত ছাড়িয়েছে, পেটে খেল গুঁতো। স্বদেশী মানুষের খুলির স্বাদ আগে আর পায়নি বোধহয় কোনদিন, আজ পেল। গাঁক করে বাতাস সহ শব্দ বেরিয়ে এল মরা মাছের মত হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ দিয়ে। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল শরীর।

তামার নলে ডার্ট পরিয়ে ফেলেছে রবিন। ঠোঁটে লাগিয়ে শিকারীকে লক্ষ্য করে জোরে এক ফুঁ মারল। মুসার মাথার গুঁতোর ব্যথা সামলে উঠতে পারেনি তখনও লোকটা। এক হাতে পেট চেপে ধরে রেখেছে। বাহুর মাংসে এসে বিঁধল রবিনের ছোঁড়া ডার্ট। হাঁ করা মুখটা কয়েক সেকেন্ড হাঁ হয়েই রইল। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল সে। ছাউনি থেকে দড়ি এনে গাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল তাকে মুসা আর রবিন।

'গেল একটা।' মাটি থেকে ধনুকটা কুড়িয়ে নিল মুসা। শিকারীর তূণটা খুলে নিয়ে কাঁধে পরল।

মূল বাড়ির সামনের দরজা খোলার শব্দ হলো। পিস্তল হাতে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে লিওনার্ড। কিসের শব্দ দেখার চেষ্টা করছে। ছুটে গাছের আড়ালে চলে এল তিনজনে।

'তীর লাগাতে পারবে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' জবাব দিল মুসা। 'মিস করলে বিপদে পড়ব।

পিস্তল হাতে ছুটে আসবে সে। কিন্তু ওকে কাবু করতে না পারলে ফোনটাও ব্যবহার করা যাবে না।'

'অ্যাই, আরেক কাজ করতে পারি,' চন্দ্রাবতী বলল। 'বোটহাউসটা দেখেছি আমি। খুঁজে বের করতে পারব। বোটে রেডিও আছে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। মুসাকে বলল, 'সেটাই বরং ভাল। চলো, চুপে চুপে কেটে পড়ি।'

গাছের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে বাড়িটার কাছ থেকে সরে এল ওরা। যখন বুঝল, লিওনার্ডের কানে শব্দ যাবে না, তখন দৌড়ানো শুরু করল। জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ানো খুব কঠিন। শিকড়ে পা বেধে যাচ্ছে, লতা জড়িয়ে ধরছে শরীর, হাতে-মুখে ডালের খোঁচা খাচ্ছে; উপরন্তু মুসা আর রবিনের খালি পায়ে বিঁধছে বেরিয়ে থাকা শিকড়ের চোখা মাথা। তার ওপর গরম। মুহূর্তে ঘেমে, নেয়ে গেল। কিন্তু কোন কিছুই দমাতে পারল না ওদের।

'বেশি দূরে নেই আর,' রাজকুমারী বলল।

'হুঁ,' হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল মুসা।

হঠাৎ যেন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল রবিন। কয়েক কদম দূরে মাটিতে কি যেন শুঁকছে একটা জাগুয়ার।

'এল কোত্থেকে?' ফিসফিস করে বলল সে।

'কি জানি!' তীর-ধনুক রেডি করল মুসা। 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। যতদূর জানি, চিতাবাঘ পরিবারের সবচেয়ে বদমেজাজী জানোয়ার এই জাগুয়ার। তা ছাড়া এখানে নিশ্চয় খুব দুর্ব্যবহার চলে ওদের ওপর। মেজাজ অনেক বেশি তিরিক্ষি হয়ে থাকার কথা।'

'কি শুঁকছে?' রাজকুমারী বলল।

'চুপ! চুপ!' থামানোর চেষ্টা করল মুসা।

দেরি হয়ে গেছে। শব্দ শুনে মুখ তুলল জাগুয়ারটা। সবুজ চোখ জোড়া স্থির হলো ওদের ওপর। ভয়ঙ্কর এক গর্জন করে উঠল।

আর কোন উপায় না দেখে ধনুক তুলল মুসা। কিন্তু তীর ছোঁড়ার সময় পেল না। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জানোয়ারটা। কাঁধে নখের চাপ অনুভব করল মুসা। মুখে লাগছে দুর্গন্ধে ভরা গরম নিঃশ্বাস। হাঁ করা ভয়ানক মুখের শ্বদন্তগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

দুই হাতে মাথা চেপে ধরে জানোয়ারটাকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করতে লাগল মুসা।

আবার গর্জে উঠল ওটা। গরম নিঃশ্বাসের হলকা এসে মুসার মুখে লাগল। মনে হলো কানের পর্দা ফেটে গেছে। কিন্তু হাল ছাড়ল না সে। কিছুতেই নাকে-মুখে কামড় বসাতে দিল না।

কয়েক মুহূর্ত পরেই তার গায়ের ওপর ঢলে পড়ল জাগুয়ারটা। কারণটা বুঝতে সময় লাগল মুসার। নিশ্চয় ডার্ট বিঁধিয়ে দিয়েছে রবিন।

'আরে সরাও না!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'একা পারছি না তো। এত ওজন, বাপরে বাপ!'

'তোমার চেয়েও বেশি?' হাসতে হাসতে জাগুয়ারটাকে সরানোর জন্যে উবু হলো রবিন।

টেনেহিঁচড়ে মুসার গা থেকে নামানো হলো ওটাকে।

নিজের কাঁধ ছুঁয়ে দেখল মুসা। নখের আঁচড়ে সামান্য কেটে গেছে মাত্র। রক্ত পড়ছে, তবে বেশি না। এ ছাড়া আর তেমন ক্ষতি হয়নি।

একটু আগে জাগুয়ারটা কি শুঁকেছিল, দেখে, মাথার শিরায় রক্ত ঝলকে উঠল রবিনের। কিশোরের শার্ট ছেঁড়া কাপড়। হাতে নিয়ে বুঝল, রক্তমাখা। মানুষের চিৎকারটার কথা মনে পড়ল তার। অবশ হয়ে আসতে চাইল শরীর। আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাঁটু দুটো।

কিন্তু মুসা এবারও মেনে নিতে পারল না—বুনো জানোয়ারের হাতে মারা পড়েছে কিশোর। তাগাদা দিল, 'চলো, চলো, বোটহাউসটা খুঁজে বের করি আগে। তারপর দেখা যাবে।'

আবার ছুটল তিনজনে। পৌঁছে গেল একটা ছোটখাট পাহাড়ের সমান পাথুরে টিলার কাছে। তার পাশে এক চিলতে সৈকত।

'এখানেই কোথাও আছে বোটহাউসটা,' চন্দ্রাবতী বলল।

এক এক করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠল ওরা। চূড়া থেকে ঢাল বেয়ে আবার নেমে এল অন্যপাশে, সৈকতে। পানিকে একপাশে রেখে সৈকত ধরে এগোল।

অবশেষে পাওয়া গেল ওটা।

'ওই যে, বোটহাউস,' রাজকুমারী বলল।

হাঁক শোনা গেল এই সময়, 'ওদিকে যাবার আর দরকার নেই। থামো!'

ফিরে তাকাল তিনজনে। টিলার চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন বেরিংটন। ধনুকটা তোলা। ওদের দিকে।

'দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই,' বেরিংটন বললেন। 'একেবারে খোলা জায়গায় রয়েছ তোমরা। আমার নিশানা মিস হবে না, বিশ্বাস করতে পারো।'

চারপাশে তাকাল রবিন। বুঝল, মিথ্যে বলছেন না বেরিংটন। ডাইভ দিয়ে পানিতে গিয়ে পড়ার বা পাথরের আড়ালে লুকানোর আগেই তাকে বিঁধে ফেলবে তীর। মুসা আর চন্দ্রাবতীও তার মতই অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'তামার পাইপটা ফেলে দাও!' আদেশ দিলেন বেরিংটন। 'মুসা, তোমার হাতের তীরও ফেলো।'

আর কোন উপায় না দেখে বেরিংটন যা করতে বললেন, করল দুজনে।

'ভালই দেখালে,' বেরিংটন বললেন। 'কিশোরের চেয়ে তোমাদের খুঁজে বের করতে দেরি হয়েছে।'

কিশোরকে পেয়ে গেছে! হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হলো রবিনের। 'মেরে ফেলেছেন নাকি ওকে?'

'বেশি চালাকি করেছিল,' জবাব দিলেন বেরিংটন। 'আমাদের কাজ কঠিন করে তোলার জন্যে খাঁচার কয়েকটা জানোয়ার ছেড়ে দিয়েছিল। উল্টে ওগুলোই ওকে ধরে ছিঁড়ে খেয়েছে। চিহ্ন অনুসরণ করে গিয়ে কয়েক টুকরো রক্তাক্ত ছেঁড়া কাপড়

বাদে আর কিছুই পাইনি। ওকে বাদ দিয়ে তখন তোমাদের পিছু নিলাম। চন্দ্রাবতীকেও বের করে নিয়ে এসেছ দেখি। চালাক ছেলে। হাল্লো, ইয়োর রয়্যাল হাইনেস।'

'জাহান্নামে যা, শয়তানের বাচ্চা!' হিন্দিতে গালি দিল চন্দ্রাবতী।

'কি বলল ও?' বুঝতে পারলেন না বেরিংটন। 'এ কোন্ জাতের ভাষা!'

'ও আর বুঝে কি করবেন,' রবিন বলল। 'অতি সাধারণ একটা গালি দিল।'

'শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছ তোমরা,' শান্তকণ্ঠে বললেন বেরিংটন। 'সারভাইভাল অভ দা ফিটেস্ট কথাটা শোনোনি কখনও? পৃথিবীটা হলো টিকে থাকার জায়গা। দুর্বলের ঠাঁই নেই এখানে। একজন আরেকজনের ওপর কর্তৃত্ব করে বেঁচে থাকবে, এটাই হলো নিয়ম। তোমাদের চেয়ে আমি শক্তিমান, আমার সঙ্গে পারোনি, কাজেই তোমাদের মরতে হবে।'

'কাউকে যদি মরতেই হয়, মিস্টার বেরিংটন,' অন্ধকারে শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ, 'সেটা আপনাকে।'

হা হা করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল রবিনের। ওই কণ্ঠ দুনিয়ার যে কোনখানে চিনতে পারবে সে। পাথরের টিলার ওপাশে অন্ধকার বনের দিকে তাকিয়ে রইল। কিশোরকে দেখতে পেল না, তবে জানে ওখানেই আছে।

'আমি জানতাম, কিশোর মরবে না,' আবেগে বুজে আসতে চাইল মুসার গলা। এত সহজে মরতে পারে না ও। কিশোর পাশাকে ঠকানোর বুদ্ধি এই উন্মাদটার নেই।'

'কেউ আমাকে খায়নি, বেরিংটন,' কিশোর বলল। 'জানোয়ারগুলোকে ছেড়ে দেয়ার পর গাছে উঠে বসে ছিলাম। তারপর আপনার ইংরেজ বন্ধুর চিৎকার শুনলাম। মনে হয় বাঘে তাড়া করেছিল, একটা গর্তে লাফিয়ে পড়ে প্রাণে বেঁচেছে। হয়তো এখনও ওখানেই আছে। এতবড় শিকারী, আহা! প্রাণের ভয়ে বসে বসে ইঁদুরের মতই কাঁপছে নিশ্চয় এখন।'

কার চিৎকার শুনেছিল, বুঝল এখন রবিন।

চন্দ্রাবতীর দিকে তাকাল। রাজকুমারী তাকিয়ে আছে অন্ধকার বনের দিকে। চিৎকার করে কি যেন বলল। হিন্দিতে নয়। দুর্বোধ্য ভাষা। বুঝল না কেউ।

'আরেক বুদ্ধি করলাম তখন, বেরিংটন,' কিশোর বলল। 'একজন গর্তে পড়েছে, বাকি রয়ে গেছেন দুজন। গাছ থেকে নেমে বাঘের খালি খাঁচার মধ্যে ঢুকলাম। রক্তমাখা কিছু হাড়ের টুকরো পড়ে ছিল তখনও। শার্ট ছিঁড়ে ডলে ডলে রক্ত লাগালাম। তারপর পথের ওপর ফেলে রেখে আবার গিয়ে উঠলাম গাছে। আপনি ওগুলো দেখে ভাবলেন আমাকে বাঘে খেয়েছে। অথচ ওপর দিকে তাকালেই আমাকে দেখতে পেতেন। বুঝলাম, মুখে যতটা ফটর-ফটর করেন, তত বড় শিকারী আপনি নন। খাঁচায় আটকানো জানোয়ার মারতে মারতে শিকারীর সতর্কতা একেবারেই গেছে আপনার। নইলে অনেক আগেই খতম করে দিতে পারতেন আমাকে। যাই হোক, মুসা আর জাগুয়ারের চিৎকার শুনে সেদিকে দৌড় দিলাম। রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখলাম একটা ধনুক, তাতে তীর পরানো আছে তখনও। মনে হয় আপনার ওই ইংরেজ বন্ধুর অস্ত্রই হবে ওটা। বাঘের তাড়া খেয়ে

বেচারার পেসাব করে দেয়ার অবস্থা হয়েছিল, বোঝা গেছে এ থেকেই। ওটা এখন আমার হাতে, বেরিংটন।'

চিৎকার করে আবার কিছু বলল চন্দ্রাবতী।

'কি বলছ?' তীরটা রবিনের দিকে তাক করে রেখে চন্দ্রাবতীকে জিজ্ঞেস করলেন বেরিংটন।

ইংরেজীতে জবাব দিল রাজকুমারী, 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, শীঘ্রিই তো আমার মৃত্যু হবে, আমাকে যেন নরকে না পাঠায়।'

'তা বোধহয় পাঠাবে না। অত খারাপ তো তোমরা নও। তোমাদের জন্যে সত্যি দুঃখ হচ্ছে আমার, চালাক মানুষদের আমার ভাল লাগে। কিন্তু কিছুই করার নেই। মরতেই হবে। তোমাদের ছেড়ে দিলে জেলে যেতে হবে আমাকে।'

'আমি বলেছি, বেরিংটন,' চিৎকার করে বলল কিশোর, 'আমার হাতে তীর-ধনুক আছে। আপনার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছি আমি। নিশানাও আমার খারাপ না।'

হাসিতে ফেটে পড়ল বেরিংটন। 'মিথ্যে বলে আর ভোলাতে পারবে না আমাকে, খোকা। জীবনে একবারও ক্রসবো ব্যবহার করেছ কিনা সন্দেহ আছে আমার। এ জিনিসে হাত ঠিক করতে বছরের পর বছর প্র্যাকটিস করতে হয়। তুমি একটা ছোঁড়ার আগেই সৈকতে দাঁড়ানো তিনজনকে মেরে ফেলতে পারব আমি। প্রমাণ চাও? বেশ, প্রথমে রবিনকে নিশানা করছি আমি। তুমি একটা তীর ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওকে মেরে ফেলব।'

ধনুকটা আরও ওপরে তুললেন বেরিংটন। রবিনের দিকে তাক করেই রেখেছিলেন, সেটাকে নিখুঁত করলেন আরও।

কিশোর জানে, সত্যি কথাই বলেছেন বেরিংটন। একশো বার ছুঁড়েও একবার লাগাতে পারবে কিনা সে, সন্দেহ।

চোখ বুজে ফেলেছে রবিন। বেরিংটনের ঘরের দেয়ালে বসানো বাইসনের মাথাটার কথা মনে পড়ল ওর। ভাবল, জানোয়ারটার নিষ্প্রাণ চোখের সতর্কবাণী কোন কাজে লাগল না। মরতে চলেছে সে।

দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে উঠল চন্দ্রাবতী। আঙুল তুলল বেরিংটনের দিকে।

যেন পাথর ফুঁড়ে উদয় হলো একটা ছায়া। চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেরিংটনের ওপর। হাত থেকে ক্রসবো ছুটে গেল তাঁর। তাঁকে নিয়ে পাথরের ঢাল বেয়ে সৈকতের ওপর গড়িয়ে পড়ল তুষার চিতাটা। ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠল। বিকট হাঁ। বেরিংটনের টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলার জন্যে রাজকুমারীর অনুমতি চাইছে।

সেই একই রকম দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলল চন্দ্রাবতী।

কামড় দিল না আর চিতাটা। বেরিংটনের গায়ের ওপর চেপে বসে রইল। ঝাড়া দিয়ে ওটাকে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন বেরিংটন। নিচু হয়ে মাটি থেকে তামার নলটা কুড়িয়ে নিয়েছে ততক্ষণে রবিন। ছুটে গিয়ে একেবারে বেরিংটনের উরুতে নলের মুখ ঠেকিয়ে ফুঁ দিয়ে ডার্ট ঢুকিয়ে দিল।

ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলেন বেরিংটন। কয়েক সেকেন্ড নড়াচড়া করল হাত-পাগুলো। তারপর নিথর হয়ে গেল।

মস্ত জিভ বের করে চন্দ্রাবতীর দিকে তাকিয়ে আছে কান্তা। নীরবে যেন প্রশ্ন করছে, এবার কি করব?

'নেমে আয়, কান্তা।'

চিতাটার দিকে এগিয়ে গেল রাজকুমারী।

চিতাটাও এগিয়ে এল তার দিকে। গলা জড়িয়ে ধরল চন্দ্রাবতী।

বন থেকে বেরিয়ে এসেছে কিশোর। ক্রসবো হাতে এসে দাঁড়াল টিলার চূড়ায়। ঢাল বেয়ে নেমে এল ধীরে সুস্থে।

চন্দ্রাবতীর দিকে তাকাল মুসা, 'মোটেও প্রার্থনা করোনি তুমি, তাই না? দুর্বোধ্য ভাষায় চিতাটাকে ডেকেছ।'

'কিশোর যখন বলল, কয়েকটা জানোয়ারকে ছেড়ে দিয়েছে,' রাজকুমারী বলল, 'শিওর হলাম, যে কান্তাকে অবশ্যই ছেড়েছে সে। মুক্ত থাকলে আমার ডাকে সাড়া দেবেই। চিৎকার করে ডাকতে শুরু করলাম তখন।'

'হুঁ,' রবিন বলল। 'তিনটা শয়তানই কাবু হয়েছে। এখন পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'আরও ছুটো ছাড়া রয়ে গেছে এখনও,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'ইভিলিন আর লিওনার্ড। গাছের সঙ্গে যেটাকে বেঁধে রেখে এসেছি, সেটাকে দেখতে পেলে বাঁধন খুলে দিয়ে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করতে পারে। ওর জ্ঞান ফিরে এলে আবার বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে আমাদের।'

'তা বটে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই, যত ছোটই হোক,' কিশোর বলল। 'রবিন যাও, বোটহাউসে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করো। মুসা, তুমি এসো আমার সঙ্গে। চন্দ্রাবতী, কান্তাকে নিয়ে তুমিও এসো। ও সাথে থাকলে অন্য কেন জানোয়ার সহজে কাছে ঘেঁষবে না আমাদের।'

পাঁচ রাত পর আবার রকি বীচ চিড়িয়াখানায় ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। একটা নাচের পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত করা হয়েছে, ফান্ড জোগাড়ের জন্যে। জু প্লাজাকে সাজানো হয়েছে। গাছগুলো জড়ানো আলোকমালায়। হাজার হাজার নানা বর্ণের আলো মিটমিট করে জ্বলছে। ব্যান্ড বাজছে। সীল-ফোয়ারাকে ঘিরে তালে তালে নাচছে সুবেশী নারী-পুরুষ।

রবিন আর কিশোর দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। স্কুলের কয়েকজন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে। মুসা গিয়ে যোগ দিয়েছে নাচে। সঙ্গী হিসেবে পাকড়াও করেছে চন্দ্রাবতীকে। তার হবু বর ভানুস্বামীর বাদামী মুখটাকে কালো করে দিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে নাচা শুরু করেছে মুসা। ঈর্ষার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছে বেচারা ভানু। ফোঁস ফোঁস করছে, আর সুযোগ পেলেই শুনিয়ে দিচ্ছে আমেরিকায় আসাটা উচিত হয়নি মোটেও। বেশি কিছু বলতেও পারছে না পাছে চন্দ্রাবতী রেগে যায় সে ভয়ে।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কিশোর ও রবিনের সামনে দাঁড়ালেন পরিচালক রিচার্ড বোম্যান। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, কেমন লাগছে পার্টি?' তাঁর টাইতে আঁকা রয়েছে একটা তুষার চিতার ছবি।

'দারুণ,' জবাব দিল রবিন। 'আপনার নতুন মেহমানরা কেমন আছে?'

'খুব ভাল আছে,' গর্বিত পিতার ভঙ্গিতে জবাব দিলেন পরিচালক। জু আইল্যান্ডের সমস্ত জানোয়ার নিয়ে আসা হয়েছে তাঁর চিড়িয়াখানায়। বেরিংটন ও তাঁর দোস্তদের নিয়ে গিয়ে জেলে ভরেছে পুলিশ। জু আইল্যান্ডে অবৈধ ভাবে শিকার করে ট্রফি হিসেবে বিপন্ন প্রাণীর মাথা নিয়ে গেছে যে সব নির্দয় শিকারী, পুলিশ তাদেরও খোঁজ করছে।

'ওই দেখো, কে আসছেন,' রবিনকে বলল কিশোর।

ফিরে তাকাল রবিন। দেখল, রিফ্রেশমেন্ট টেবিলের দিকে চলেছেন ডক্টর হেমিং। তাঁর পেছনে এক সারিতে মার্চ করতে করতে চলেছে ববি, টপ আর বেবি জুপিটার। তিনটের মাথায়ই রঙিন হ্যাট। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কিশোরদের দিকে হাত নাড়ল টপ আর বেবি জুপিটার। সাইন ল্যাংগুয়েজে ববি বলল, 'চিড়িয়াখানার বন্ধু!'

বিচিত্র দৃশ্য দেখে নাচ থামিয়ে ছুটতে ছুটতে এল মুসা আর চন্দ্রাবতী শিম্পাঞ্জিগুলোর কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেল একেকজনের।

চন্দ্রাবতী বলল, 'এই চলো না তোমরা, কান্তাকে একবার দেখে আসি।'

'চলো,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি মুসা।

তিন গোয়েন্দার পাশে পাশে হেঁটে চলল রাজকুমারী। পেছনে মুখ গোমড়া করে আসতে লাগল ভানুস্বামী।

আজ রাতে দিনের খাঁচাতেই রাখা হয়েছে জানোয়ারগুলোকে, পার্টির লোকজনের ইচ্ছে হলে যাতে গিয়ে দেখতে পারে।

তুষারে ঢাকা কৃত্রিম হিমালয়ের পাদদেশে এসে দাঁড়াল দলটা। আধশোয়া হয়ে আছে পুরুষ চিতাটা। কান্তা ওটার কোলের কাছে কুঁকড়িসুকড়ি হয়ে শুয়ে আছে। আদর করে তার গা চেটে দিচ্ছে পুরুষটা।

'কি বুঝলে?' চন্দ্রাবতীর দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'তোমার দিকে তো আর ফিরেও তাকাচ্ছে না তোমার কান্তা।'

হাসল চন্দ্রাবতী। 'আমার চেয়ে বেশি পছন্দের একজনকে পেয়ে গেছে, তাকাবে কেন।'

'খুব সুখী মনে হচ্ছে ওদের,' মুসা বলল।

'হ্যাঁ। তবে তার জন্যে আমি দুঃখিত নই, বরং ভাল লাগছে, পুরোপুরি আপন জগতে ফিরে যেতে না পারলেও আপনার একজনকে পেয়ে গেছে কান্তা। এটাই চেয়েছিলাম আমি।' রাজকুমারীর মুখে হাসি, চোখে জল। অবশ্যই আনন্দের।

'অনেক তো দেখা হলো,' রবিন বলল, 'চলো, ফিরে যাই। তাড়াতাড়ি না গেলে আজ না খেয়ে থাকতে হবে। খাবার সব সাফ করে দেবে। খুব খিদে পেয়েছে আমার।'

'আমারও,' কিশোর বলে উঠল। 'চলো, চলো।'

'খাইছে!' মুসার চোখ কপালে। 'আজ দেখি আমার রোগে সবাইকে ধরল, আমিই বাদ। খাই খাই করি বলে না আমার খালি বদনাম।'

'বদনাম কি আর ঘুচেছে মনে করো,' হাসল রবিন। 'তোমার হলো খাবার দেখলেই পেটে মোচড় দেয়, আমাদের তো আর তা না। হাজার হোক প্রাণী তো,

খিদে পাবেই। সময়মত খাওয়াও লাগবে।'

'থাক, আর লেকচারের দরকার নেই,' বাধা দিল মুসা। 'বহু আগে থেকেই পেটের মধ্যে ছুঁচো নাচছে আমার। রাজকুমারীর সামনে লজ্জায় বলতে পারছিলাম না।'

হাসাহাসি শুরু করল সবাই, ভানুস্বামী বাদে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে চন্দ্রাবতীকে হাসতে দেখে গোমড়া মুখটা শ্রাবণের মেঘে ঢাকা আকাশ হয়ে গেল তার।

-ঃ শেষ ঃ-